প্রাণীর আচরণ
ANIMAL BEHAVIOUR

১২ অধ্যায়

বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন ধরনের আচরণ সৃষ্টি একটি অপার রহস্য। তাই অনুসন্ধিৎসু মানুষের কাছে প্রাণীদের আচরণ নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই কৌতূহলের শেষ নেই। আর এই অনুসন্ধিৎসু মনের কৌতূহল থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ফসল ও প্রাণীদের আচরণ সম্পর্কিত বিষয় প্রাণীর আচরণ (animal behaviour)। সহজ কথায়, একটি প্রাণী যা করে বা যেভাবে করে তাই তার আচরণ। এ অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রাণীর বৈচিত্র্যময় আচরণ এবং ইথোলজির বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

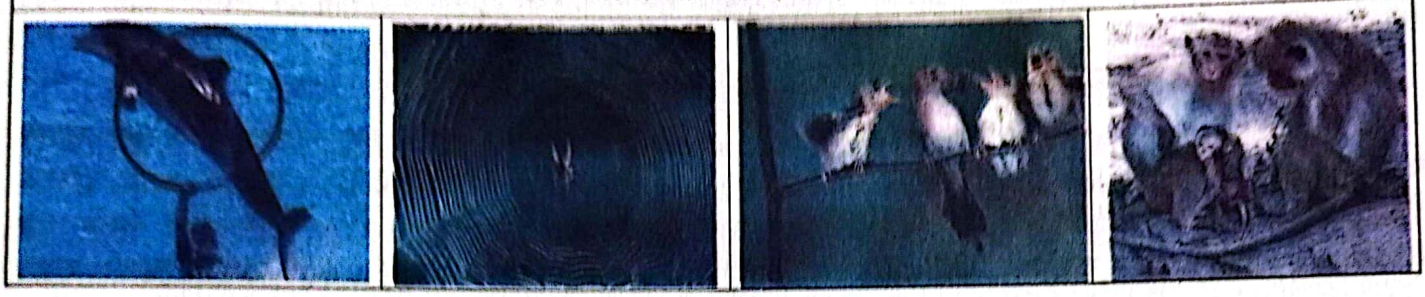

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে –

শিখনফল	বিষয়বস্তু (পিরিয়ড সংখ্যা ৮)
১. আচরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারবে। ২. সহজাত আচরণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. প্রত্যেক প্রাণীর সহজাত আচরণ যাচাই করতে পারবে। ৪. শিখন ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. কুকুরের লালার প্রতিবর্তী ক্রিয়ার (Reflexes) উপর Pavlov এর তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবে। ৬. মৌমাছির সামাজিক সংগঠনের আলোকে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা (Altruism) ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• আচরণের প্রকৃতি (The nature of Behaviour) ○ উদ্দিপনার আচরণগত পরিবর্তন ○ আচরণ ও বংশগতির মধ্যে সম্পর্ক • সহজাত (Innate) আচরণ ○ ট্যাক্সিস (Taxes) ○ রিফ্লেক্সেস (Reflexes) ○ ইনসটিঙ্কস (Instincts) • সহজাত আচরণ যাচাই– ○ শীতের পাখির মাইগ্রেশন ○ মাকড়শার জাল ○ অপত্যের প্রতি যত্ন-মাছ, ব্যাঙ, পাখি • শিখন (Learning) ○ অভ্যাসগত (Habituation) ○ অনুকরণ (Imprinting) • Pavlov এর কাজ ○ কুকুরের লালার প্রতিবর্তী ক্রিয়া • সামাজিক আচরণ ○ পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা (Altruism) মৌমাছির সামাজিক সংগঠন

১২.১ আচরণের প্রকৃতি (The Nature of Behaviour)

প্রাণীদের আচরণের প্রকৃতিতে রয়েছে বৈচিত্র্যময়তা। জন্মগতভাবেই বিভিন্ন প্রাণীর মাঝে আচরণগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এটি ছাড়াও পরিবেশগত কারণে (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা) প্রাণীরা বিভিন্ন সময়ে তাদের আচরণে পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। **প্রাণিবিজ্ঞানের যে শাখায় প্রাণীদের আচরণ** (animal behaviour) **সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় তাকে ইথোলজি বা আচরণ বিদ্যা** (Ethology, Gr, *ethos* = behaviours + *logos* = knowledge) **বলে। নিকোলাস টিনবার্জেন** (Nikolas Tinbergen)**-কে ইথোলোজির জনক বলা হয়।**

কার্ল ভন ফ্রিশ (Karl von Frisch, 1886-1982), **কোনরাড লরেঞ্জ** (Konrad Lorenz, 1903-1989) ও **নিকোলাস টিনবার্জেন** (Nikolas Tinbergen, 1907-1988) আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রাণীর আচরণবিদ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এজন্য তাঁরা 1973 সালে শারীরবিজ্ঞান ও মেডিসিনের ওপর নোবেল পুরস্কার পান। বিভিন্ন উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়ার

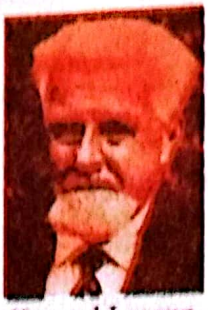
Konrad Lorenz (1903-1989)

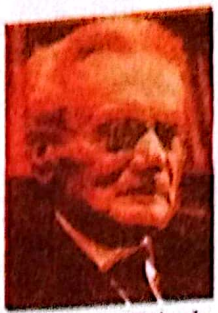
Karl von Frisch (1886-1982)

Nikolas Tinbergen (1907-1988)

পরিপ্রেক্ষিতে প্রাণীর আচরণগত পরিবর্তন দেখা যায়। প্রাণীর সাড়া দানের বিষয়টি পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং বহিঃস্থ বা অন্তঃস্থ উদ্দীপনার কারণে ঘটে থাকে। যেমন– একটি ক্ষুধার্ত প্রাণীর সামনে প্লেটভর্তি খাবার যে প্রেরণার সৃষ্টি করবে তা ভরপেট প্রাণীতে করবে না।

উদ্দীপনায় আচরণগত পরিবর্তন (Changes of Behaviour by Stimulation)

উদ্দীপকের (stimulus) প্রতি প্রাণীরা প্রতিক্রিয়া (response) প্রদর্শনের মাধ্যমেই তার আচরণের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। উদ্দীপনার (stimulation) উৎপত্তি প্রাণীর ভেতর থেকে হতে পারে অথবা পরিবেশ (বাহির) থেকে আসতে পারে। বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাণীতে যে পরিবর্তন সাধিত হয় বা প্রাণী যে সাড়া প্রদান করে তাই **প্রাণীর আচরণ**। তাই বলা যায়, উদ্দীপনার দ্বারাই প্রাণীর আচরণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন– রেসাস বানর (*Macaca mulatta*) প্রজাতির সদস্যরা সাধারণভাবে পরস্পর থেকে একটু আলাদা থাকলেও প্রচণ্ড শীতের তীব্রতা থেকে বাঁচার জন্য পরস্পর জড়াজড়ি করে অবস্থান করে। তাদের এ আচরণ দেহের উষ্ণতা বাড়াতে সহায়তা করে। বাহ্যিক পরিবেশের তাপমাত্রার পরিবর্তনের জন্য এরূপ হয়। এক্ষেত্রে তাপমাত্রা বাহ্যিক উদ্দীপক (external stimuli) হিসেবে কাজ করে। বস্তুত প্রাণীর স্নায়ু, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও পেশিতন্ত্রের সমন্বিত কার্যকারিতায় উদ্দীপনা সংঘটিত হয়। সমগ্র দেহ বা দেহাংশ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন, অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন, কণ্ঠস্বর বা ধ্বনি উচ্চারণ, গন্ধ ছড়ানো, আতঙ্কিত হওয়া, বর্ণ পরিবর্তন, অপত্য লালন, রাগ-বিরাগ, অভিপ্রয়াণ, লোম খাড়া হয়ে যাওয়া প্রভৃতি ক্রিয়াকে আচরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রখ্যাত প্রাণী আচরণবিদ **ম্যানিং** (Manning, 1972) মনে করেন, **জীব তার বাহ্যিক পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার পর তার দেহাভ্যন্তরের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া করে থাকে।**

চিত্র ১২.১ : শীতের প্রভাবে রেসাস বানরেরা একত্রে জড় হয়

প্রতিক্রিয়া বলতে উদ্দীপনাহেতু দেহে কতিপয় পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। আর উদ্দীপনা (stimulus) ও প্রতিক্রিয়ার (response) ফলই হলো আচরণ। তবে প্রতিটি আচরণের পেছনে থাকে সংবেদনের ভূমিকা। আর সংবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই সৃষ্টি হয় প্রতিক্রিয়া। যার ফলে **উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার** (stimulus-response) মাধ্যমেই আচরণের প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করা যায়। তবে উক্ত বিষয়টি প্রাণীর আচরণের সরলতম ব্যাখ্যা। যেকোনো উদ্দীপক সরাসরি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্র (nervous system) এবং দৈহিক প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে। সুতরাং পরিপূর্ণ ব্যাখ্যায় আচরণকে শুধু উদ্দীপকের ফলাফল হিসেবে গণ্য না করে, প্রাণিদেহের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল হিসেবে গণ্য করা হয়।

তাই আচরণের আধুনিক ব্যাখ্যায়, উদ্দীপক-প্রাণী-প্রতিক্রিয়া (Stimulus-Organism-Response) ধারণাটি বেশি গ্রহণযোগ্য। তবে আরও সহজে বলা যায়, উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের ব্যাপারে সংগ্রাহক (receptor) উদ্দীপককে শনাক্ত করে, সঞ্চালক (conductor) উদ্দীপনাকে সমন্বিত করে এবং কার্যকারক (effector) প্রতিক্রিয়া বা সাড়া দিয়ে আচরণের প্রকাশ ঘটায়। রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ–

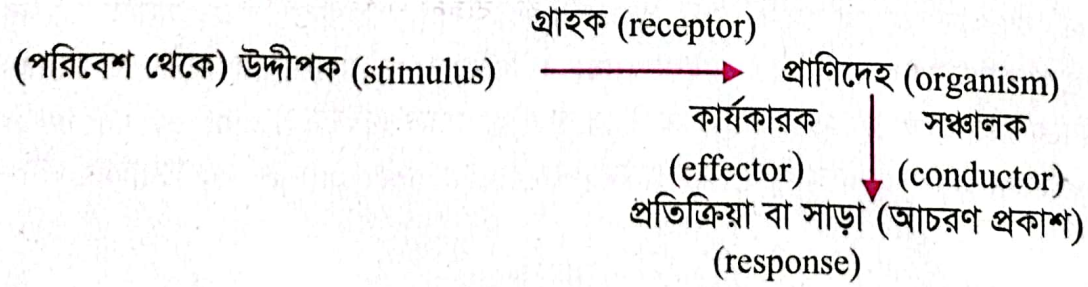

উদ্দীপকের ধরন (Types of Stimulus)

অধিকাংশ প্রাণী একাধিক ধরনের উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেয়। প্রাণী প্রধানত চার ধরনের উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিয়ে আচরণের পরিবর্তন ঘটায়। এগুলো হলো–

১। **রাসায়নিক উদ্দীপক** (Chemical stimuli) : বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রাণীরা বায়ুতে বা পানিতে খুব অল্প পরিমাণে রাসায়নিক উদ্দীপকের নিঃসরণ ঘটায়। এগুলো প্রজাতি নির্দিষ্ট। প্রাণীর যৌন মিলন, সীমানা নির্ধারণ, গমন পথ চিহ্নিতকরণ, শাবক শনাক্তকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন আচরণে রাসায়নিক উদ্দীপক ব্যবহৃত হয়।

২। **শব্দ উদ্দীপক** (Sound stimuli) : শব্দ প্রাণীর অন্যতম প্রধান যোগাযোগ মাধ্যম। এ উদ্দীপনায় প্রাণীর আচরণের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। সাধারণত দূরে অবস্থানকারী সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য শব্দ উদ্দীপক ব্যবহৃত হয়। প্রাণীর যৌন মিলন, শিকারি হতে সতর্ক করা, স্বজাতি শনাক্তকরণ, খাদ্যের প্রাচুর্যের সংবাদ দেওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন আচরণে শব্দ উদ্দীপক ব্যবহৃত হয়।

৩। **দর্শন উদ্দীপক** (Visual stimuli) : দেখতে সক্ষম প্রাণীর ক্ষেত্রে আলোক একটি উত্তম যোগাযোগ মাধ্যম। নিশাচর প্রাণীরা সাধারণ আলোতে দেখে না কিন্তু তারা আলোর অবলোহিত (infrared) তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তু শনাক্ত করে। মরুভূমির সাপ রাতের বেলায় এ পদ্ধতিতে উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট প্রাণী শিকার করে। গভীর সমুদ্রে বসবাসকারী অনেক মাছ ও অনেক পতঙ্গের আলোক উৎপাদনকারী অঙ্গ আছে যা তাদের চলাচল, শিকার ধরা ও প্রজননের কাজে ব্যবহৃত হয়। অনেক প্রাণী যেমন– বানর, হাতি, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি তাদের অঙ্গভঙ্গি দ্বারা বিভিন্ন রকম আচরণ প্রদর্শন করে সমগোত্রীয় কিংবা অন্য প্রজাতির সদস্যদের আকর্ষণ করে। পাখি তার বাচ্চার হা করা মুখ দেখে দ্রুত সাড়া দিয়ে মুখে খাবার ফেলে।

৪। **স্পর্শ উদ্দীপক** (Touch stimuli) : প্রাণিজগতের বিভিন্ন প্রজাতিতে স্পর্শ উদ্দীপকের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। শারীরিক সংযোগের দ্বারা স্পর্শ উদ্দীপক প্রাণীর আচরণে পরিবর্তন ঘটায়। কিছু পতঙ্গভোজী স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং জেলিফিশ স্পর্শ উদ্দীপক দ্বারা তাদের খাদ্য সংগ্রহ করে। অনেক পতঙ্গভোজী স্তন্যপায়ীর (যেমন– চিকা) তুণ্ডে এমন লোম থাকে যা দ্বারা এরা ০.১ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের খাদ্যকেও শনাক্ত করতে পারে। সামাজিক পতঙ্গ মৌমাছির কর্মীগুলো তরুণ মৌমাছির অ্যান্টেনার সংস্পর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে খাবার দিতে উদ্বুদ্ধ হয়।

প্রাণীর আচরণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Animal behaviour)

(১) প্রাণীর আচরণ সহজাত ও শিখন উভয় ধরনেরই হয়ে থাকে। (২) প্রাণীর আচরণ অভিযোজনিক। উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিয়ে প্রতিটি প্রাণী প্রকৃতিতে টিকে থাকে। (৩) জিন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা উভয়ের দ্বারাই প্রাণীর আচরণ প্রভাবিত হয়। (৪) প্রাণীর কিছু আচরণ চক্রাকারে সংঘটিত হয়। (৫) আচরণের দ্বারা প্রাণী দ্রুত ও সুবিধাজনক উপায়ে তার পরিবেশের প্রতি সাড়া প্রদান করে। (৬) বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উদ্দীপক সম্মিলিতভাবে বিশেষ আচরণকে সক্রিয় করে। (৭) প্রাণীর আচরণে সহজাত এবং শিখন উভয় ধরনের উপাদান থাকে।

আচরণ ও বংশগতির মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Behaviour and Heredity)

আচরণ নিয়ন্ত্রণে বংশগতি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। আচরণ ও বংশগতির মধ্যে অন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান। পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্যাবলি সাধারণত সন্তান-সন্ততি পেয়ে থাকে। পৃথিবীর সব জীবের ক্ষেত্রেই এ প্রাকৃতিক নিয়ম প্রযোজ্য। তাই বলা যায়, পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্যাবলি, বংশপরম্পরায় সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারণের প্রক্রিয়াই হলো **বংশগতি** (heredity)। বংশগতি বস্তুর (hereditary material) মাধ্যমেই পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্য তার সন্তান-সন্ততিতে বাহিত হয়। **ক্রোমোজোম** হলো বংশগতি বস্তুর মুখ্য উপাদান। এ ক্রোমোজোমে রয়েছে DNA (Deoxyribonucleic acid) যেখানে জিনগুলো সুসজ্জিত থাকে। জিনই হচ্ছে বংশগতীয় বৈশিষ্ট্যের ধারক, বাহক ও নিয়ন্ত্রক অর্থাৎ জিনই জীবের বাহ্যিক চরিত্রসমূহ ফুটিয়ে তোলে। জিনগুলো শিখন, স্মৃতি ও জ্ঞানের এক অস্থায়ী তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলে। প্রাণী তার পরিবেশ উপযোগী আচরণে প্রয়োজনীয় তথ্য এ ভাণ্ডার থেকে গ্রহণ ও সঞ্চয় করে থাকে। মানুষ শিখন আচরণের মাধ্যমে অনেক কিছু অভিজ্ঞতার আলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক প্রাণিপ্রজাতির আচরণ দেখলে মনে হয় স্বয়ংক্রিয়। যেমন– অন্ধকার ঘরে হঠাৎ আলো জ্বললে তেলাপোকা দ্রুত অন্ধকার কোণে দৌড়ায়। এ ঘটনায় শিখনের কিছু নেই; সম্পূর্ণ জিনগত বিষয় জড়িত। বংশপরম্পরায় এ আচরণের পরিবর্তনও হয় না।

প্রাণী তাদের সহজাত (innate) আচরণগুলো জন্মগতভাবে অর্থাৎ বংশগতির মাধ্যমে পেয়ে থাকে। প্রাণীর আচরণ কোনো একক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। বিভিন্ন লোকাসে অবস্থিত একাধিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে আচরণ প্রাণীর একটি জটিল বৈশিষ্ট্য। জিন নির্ধারিত প্রাণীদের যেসব আচরণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদর্শিত হয় এবং প্রজাতির অন্য কোনো সদস্যকে (conspecifics) না দেখেই বা অন্যের কাছ থেকে না শিখেই প্রকাশিত হয় তাকে **নির্ধারিত ক্রিয়াধারা** (Fixed Action Pattern, সংক্ষেপে-FAP) বলা হয়। অনুরূপ পরিস্থিতিতে কোনো প্রাণীকে (একই বয়স ও একই লিঙ্গ) স্বগোত্রীয় অন্যদের থেকে আলাদা করে রাখলেও অজান্তেই এরূপ আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বংশগতির মাধ্যমে প্রাপ্ত এ ধরনের আচরণ সহজাত আচরণের (innate behaviour) অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র প্রাণিজগতে বংশগতির মাধ্যমে সঞ্চারিত আচরণের বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। এই আচরণগুলো জেনেটিক বস্তুর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে **প্রিপ্রোগ্রামড বা প্রিউয়ারড** (Preprogrammed or prewired) অবস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে। FAP-এর অন্তর্গত জিন নিয়ন্ত্রিত প্রাণীর আচরণগুলো হলো– প্রাণীদের প্রণয় ও সঙ্গম আচরণ, খাদ্যান্বেষণ, অভিপ্রয়াণ, বাসা তৈরি করা, খাদ্য মজুদ করা, নৃত্য করা, মৌমাছির চাক তৈরি, মাকড়সার জাল বুনন, কুকুর ও নেকড়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাদের লেজের অবস্থান ও মুখোভঙ্গির প্রদর্শন, মানুষের ক্ষেত্রে শৈশবে হামাগুড়ি দেওয়া, হাঁসি, কান্না করা ইত্যাদি।

চিত্র ১২.২ : নেকড়ের লেজ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আচরণ প্রদর্শন

আচরণের জীবতাত্ত্বিক ভিত্তি (Biological basis of behaviour)

(১) প্রাণীর আচরণ বংশপরম্পরায় অপরিবর্তিত অবস্থায় সঞ্চারিত হয়। (২) প্রাণীর আচরণ প্রজাতি নির্দিষ্ট। ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর আচরণও ভিন্ন ভিন্ন। (৩) জৈবিক পরিবর্তন দ্বারা প্রাণীর আচরণের পরিবর্তন ঘটে। যেমন– মানসিক রোগীকে ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসা। (৪) প্রতিটি প্রাণীর আচরণের একটি বিবর্তনিক ইতিহাস থাকে। ফলে নিকটতম কয়েকটি প্রজাতির মধ্যে অনেক আচরণে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন– জিনের গঠন অনুযায়ী শিম্পাঞ্জি ও মানুষ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শুধুমাত্র ২% জিন দ্বারা শিম্পাঞ্জি মানুষ থেকে আলাদা। (৫) কিছু কিছু আচরণ পরিবারের মধ্যে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়।

১২.২ সহজাত আচরণ (Innate Behaviour)

প্রত্যেক প্রাণীই জন্মের পরপরই বিশেষ কিছু আচরণ প্রদর্শন করতে থাকে যেগুলো বাহ্যিক পরিবেশ থেকে কেউ কখনো শিখিয়ে দেয়নি। এরূপ 'জীবদ্দশায় বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোনো প্রজাতির প্রতিটি প্রাণী পূর্বের অভিজ্ঞতা বা শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ছাড়া বংশানুক্রমে একইভাবে যেসব জন্মগত আচরণ বা কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করে তাকে **সহজাত আচরণ** (innate behaviour) বলা হয়।' অন্যভাবে বলা যায়, **অনেকগুলো প্রতিবর্তী ক্রিয়ায়** (reflex action) **সৃষ্ট সরল, পূর্ব অভিজ্ঞতা বিবর্জিত, প্রজাতি সুনির্দিষ্ট** (species specific), **শিক্ষণবিহীন ও বংশগত আচরণই হলো সহজাত আচরণ**। যেমন– পাখির বাসা বাঁধা, মাকড়সার জাল বোনা, মৌমাছির চাক তৈরি, শিশুর স্তনপান, ছাগল বা গরুর বাচ্চা জন্মের পরপরই ছোটাছুটি ইত্যাদি। এসব আচরণ সহজাতভাবে একই প্রজাতির প্রত্যেক প্রাণীতে একইভাবে বিরাজমান থাকে। **কনরাড লরেঞ্জ**-এর মতে, 'সহজাত আচরণ হলো– Unlearned species specific motor pattern.'

চিত্র ১২.৩ : মৌমাছির মৌচাক তৈরি

সহজাত আচরণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Innate behaviour)

(১) সহজাত আচরণ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থাৎ বংশগত এবং জিন নিয়ন্ত্রিত। (২) এই আচরণ একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রাণীর জন্য সুনির্দিষ্ট। এটি কোনো ব্যক্তিবিশেষের আচরণ নয়। (৩) জন্মগত হলেও সব সহজাত আচরণ জন্মের সময় থেকে আত্মপ্রকাশ করে না। পরিপক্বতার মধ্য দিয়ে উপযুক্ত সময়ে এসব আচরণের বিকাশ ঘটে। যেমন– পাখির বাসা বাঁধার প্রবৃত্তি বা ডিমে তা দেওয়ার প্রবৃত্তি জন্মের পরপরই আত্মপ্রকাশ করে না। কিন্তু শিশুর স্তনপানের প্রবৃত্তি জন্মের সময় থেকে প্রকাশিত হয়। (৪) এই আচরণ পূর্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিচালিত হয় না অর্থাৎ শিক্ষালব্ধ আচরণ নয়। এটা জন্মগত অর্জিত আচরণ। (৫) সহজাত আচরণ বংশপরম্পরায় অপরিবর্তিত থাকে। তবে

প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন সহজাত আচরণকে প্রভাবিত করে। (৬) এই আচরণ প্রাণীর কোনো না কোনো উদ্দেশ্য সাধন করে, যদিও সে এর ফলাফল সম্পর্কে পূর্বে জ্ঞাত নয়। (৭) প্রাণীর জৈবিক প্রয়োজন (যেমন– খাদ্য গ্রহণ, আত্মরক্ষা, প্রজনন ইত্যাদি) মেটাতে এই আচরণ সহায়তা করে, যা অপেক্ষাকৃত জটিল ক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ ঘটায়। (৮) এই আচরণের একটি নির্দিষ্ট পরম্পরা বিদ্যমান।

সহজাত আচরণের প্রকারভেদ (Types of Innate behaviour) : সহজাত আচরণের সুনির্দিষ্ট শ্রেণিবিন্যাস করা বেশ জটিল। কারণ বিভিন্ন প্রাণীতে বিভিন্ন ধরনের সহজাত আচরণ পরিলক্ষিত হয়। তবে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে প্রাণীতে নিম্নলিখিত ধরনের সহজাত আচরণ শনাক্ত করেছেন।

১। বিবাদসুলভ (বিগ্রহ) আচরণ (Fighting behaviour) : প্রজনন ঋতুতে জননক্ষেত্র (sexual territory) নির্বাচন ও সঙ্গী নির্বাচনের জন্য একই প্রজাতির বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে বিগ্রহ আচরণ দেখা যায়। **মাছ, পাখি ও স্তন্যপায়ী** প্রাণীদের মধ্যে এই আচরণ বেশি পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত পুরুষেরা বিগ্রহে লিপ্ত হয়। তবে অনেক সময় পুরুষ ও স্ত্রী যুগল প্রতিদ্বন্দ্বী যুগলের সঙ্গে বিগ্রহে লিপ্ত হতে দেখা যায়। যেমন– **তিন কাঁটা স্টিকল ব্যাক** মাছ (three spined stickle back fish), গায়ক পাখি (song bird), **সি-গাল** (sea gull), **এন্টিলোপ** (antelope) ইত্যাদি।

স্ত্রী এন্টিলোপের বিগ্রহ আচরণ

পুরুষ *Oryx gazella*-র বিগ্রহ আচরণ

চিত্র ১২.৪ : বিগ্রহ আচরণ

(ক) *Petromyzon*

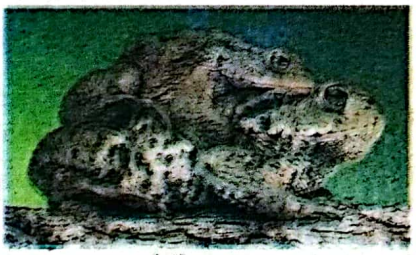

(খ) ব্যাঙ

(গ) ডুবুরি মাছরাঙা পাখি

চিত্র ১২.৫ : যুগলবন্দি ও মৈথুন আচরণ

২। যুগলবন্দি (প্রণয়) ও সঙ্গম আচরণ (Courtship and mating behaviour) : যৌন প্রজননের মুখ্য শর্ত হলো সঙ্গম। অনেকে সঙ্গমের পূর্বে একই প্রজাতির এক লিঙ্গের প্রাণী অন্য লিঙ্গের প্রাণীকে আকৃষ্ট করার জন্য কিছু আচরণ প্রদর্শন করে, এটাই যুগলবন্দি বা প্রণয় আচরণ (courtship behaviour)। বিভিন্ন প্রাণীতে আকৃষ্ট করার কাজ ভিন্নভাবে সম্পন্ন হয়। অনেক পুরুষ পাখি স্ত্রীকে আকৃষ্ট করার জন্য সঙ্গম বা **মৈথুন ডাক** (mating call) এর আশ্রয় নেয়। সিগালের নৃত্য, তিন কাঁটা মাছের জিগজাগ নৃত্য (Zig Zag dance), গায়ক পাখির মধুর গান, বকের প্রণয় ডাক (love call), কাঠঠোকরার ঢোলপেটানো ধ্বনি (drumming sound), মাছরাঙার বাসা তৈরির আবর্জনা ঠোঁটে নিয়ে প্রদর্শন ইত্যাদি দূরবর্তী স্ত্রীকে আকৃষ্ট করে। Lepidoptera বর্গের কীটপতঙ্গের স্ত্রী সদস্যের **ঘ্রাণগ্রন্থি** (scent gland) থেকে নিঃসৃত **ফেরোমনের** ঘ্রাণ পুরুষকে আকৃষ্ট করে। প্রণয়ের পর প্রাণীরা সঙ্গমে বা যৌন মিলনে লিপ্ত হয়। পাখিরা দিনে কয়েকবার সঙ্গম করে, তবে এদের সঙ্গমকাল স্বল্পস্থায়ী। স্তন্যপায়ীদের সঙ্গমের হার কম তবে সঙ্গমকাল দীর্ঘস্থায়ী।

৩। বাৎসল্য আচরণ বা অপত্যের প্রতি যত্ন (Parental care behaviour) : ডিম ও সন্তানদের লালন-পালনের জন্য পিতা বা মাতা কিংবা উভয়ই যে আচরণ প্রদর্শন করে সেগুলোই বাৎসল্য আচরণ। বিভিন্ন **মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী** প্রাণীতে বিভিন্নভাবে এই আচরণ প্রদর্শিত হয়। এই আচরণের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো– বাসা তৈরি, ডিমে তা দেওয়া, ডিম বা সন্তানদের দেহে ধারণ করা, বাচ্চা বা ছানার স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত তাদের লালন-পালন করা।

(ক) *Tilapia* (খ) *Galeichthys*

চিত্র ১২.৬ : মাছের মুখগহ্বরে ডিম সংরক্ষণ (বাৎসল্য আচরণ)

৪। অভিপ্রয়াণ আচরণ (Migration/Migratory behaviour) : জৈবিক প্রয়োজনে (যেমন– খাদ্যের জন্য, প্রজননের জন্য ইত্যাদি) প্রাণীর এক স্থান থেকে অন্যত্র গমনকেই অভিপ্রয়াণ আচরণ বলা হয়। মাছ ও পাখির মধ্যে এ জাতীয় আচরণ অত্যন্ত স্পষ্ট। স্যামন, ঈল, হেরিং, ইলিশ প্রভৃতি মাছ ডিম ছাড়ার জন্য এক স্থান থেকে বহুদূর গমন করে। বিভিন্ন কারণে কিছু কিছু মাছ, যেমন– ইলিশ, স্যামন ইত্যাদি লোনা পানি থেকে স্বাদু পানি (anadromus) এবং ঈল স্বাদু পানি থেকে লোনা পানিতে (catadromous) গমনাগমন করে। পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে, পাখির মধ্যে Golden Plover, Storks ইত্যাদি তাদের প্রজনন ঋতুতে ৬,০০০ মাইল পর্যন্ত পথ অতিক্রম করে থাকে।

৫। খাদ্যান্বেষণ আচরণ (Food seeking behaviour or Foraging behaviour) : খাদ্যান্বেষণ প্রাণীদের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। কোনো একটি প্রাণী সব ধরনের খাবার খায় না, বরং খাবারের ব্যাপারে প্রতিটি প্রাণীর একটি নির্দিষ্ট পছন্দ আছে। একই পরিবেশে বসবাসকারী ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত অনেক প্রজাতির খাদ্যের প্রকৃতিও ভিন্ন হতে পারে। যেমন– একই গাছে বসে থাকা কাক আবর্জনা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে; টিয়া পাখি ফল খায়। আবার শালিক মাটি থেকে পোকা খেয়ে জীবন ধারণ করে। পরিবেশে পছন্দনীয় খাদ্যের অভাব ঘটলে প্রাণীরা তার কাঙ্ক্ষিত খাদ্য অন্বেষণ করে বেড়ায়। পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই আচরণ অত্যন্ত স্পষ্ট।

৬। পলায়ন আচরণ (Escape behaviour) : শিকারজীবী (predator) প্রাণীদের শিকার হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনেক প্রাণীর মধ্যে পলায়ন প্রবৃত্তি বা আচরণ দেখা যায়। আত্মগোপন (কাঠঠোকরা), দ্রুত দৌড়ে পলায়ন, বর্ণের পরিবর্তন (mimicry, গিরগিটি) ইত্যাদি আচরণ প্রদর্শন করে প্রাণীরা আত্মরক্ষা করে থাকে।

৭। নিদ্রামগ্ন আচরণ (Sleeping behaviour) : প্রাণীরা সর্বদা সক্রিয় থাকে না, তাদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। এ জন্য অনেক প্রাণীকে নিদ্রামগ্ন অবস্থায় দেখা যায়। আবার অনেক প্রাণী প্রতিকূল আবহাওয়ার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য দীর্ঘস্থায়ী নিদ্রায় যায়। যেমন– শীতকালে অনেক উভচর, সরীসৃপ **শীতনিদ্রায়** (hibernation) যায়। আবার গ্রীষ্মকালে অনেক প্রাণী, যেমন– লাংফিস (lung fish), কীটপতঙ্গ, কেঁচো **গ্রীষ্মনিদ্রায়** (aestivation) সময় কাটায়।

৮। সঞ্চয়ী আচরণ বা সঞ্চয় স্বভাব (Hoarding behaviour) : অনেক প্রাণীকে ভবিষ্যতের জন্য তাদের আবাসস্থলে বা অন্য কোনো নিরাপদ স্থানে খাদ্যসামগ্রী মজুদ বা সঞ্চয় করতে দেখা যায়। এই স্বভাবকেই সঞ্চয়ী আচরণ বলা হয়। যেমন– পিঁপড়া, মৌমাছি ও অন্যান্য কিছু প্রজাতির কীটপতঙ্গ, ইঁদুর, কাঠবিড়ালি ইত্যাদির মধ্যে এই আচরণ পরিলক্ষিত হয়। অনেক বিজ্ঞানী এ ধরনের আচরণকে শিক্ষালব্ধ আচরণ (learned behaviour) বলে মনে করেন। কিন্তু Morgan *et al.* (১৯৪৭) একে সহজাত আচরণ (instinctive behaviour) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

❐ **কাজ :** তোমাদের আশপাশের বিভিন্ন প্রাণীর আচরণ গভীরভাবে লক্ষ কর এবং প্রাণীদের আচরণের একটি ছক তৈরি করে শিক্ষককে দেখাও।

সহজাত আচরণের উদাহরণ (ট্যাক্সিস, প্রতিবর্তী ক্রিয়া, সহজাত আবেগ)

১২.২.১ : চলন আচরণ বা ট্যাক্সিস (Taxis)

ট্যাক্সিস (বহুবচনে, Taxes) এক ধরনের **ওরিয়েন্টেশন** (orientation), যা উদ্দীপকের (stimulus) নির্দেশ অনুযায়ী ঘটে। অর্থাৎ **উদ্দীপকের উৎসের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে দেহের অক্ষের অবস্থানগত পরিবর্তনই হলো ট্যাক্সিস বা চলন।** প্রাণীদের চলাচলজনিত আচরণকেই ট্যাক্সিস বলা হয়। কিছু উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে প্রাণীদের ট্যাক্সিস ঘটে। যেমন– Beach fleas নামক Amphipod Crustacea দের সমুদ্র থেকে শুষ্কস্থানে নিয়ে এলে এরা এদের মাথা সরাসরি সাগরের দিকে মুখ করে অবস্থান নেয়। আর্দ্রতা ও সূর্যের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে এগুলো সমুদ্রাভিমুখে নিজেদের অবস্থান গ্রহণ করে।

অন্যভাবে বলা যায়, **উদ্দীপনার প্রভাবে কোনো বাহ্যিক লক্ষ সংক্রান্ত বা গতিপথ সংক্রান্ত** (directional) **জীবদেহের সামগ্রিক চলনই হলো ট্যাক্সিস।** অর্থাৎ ট্যাক্সিস হলো উদ্দীপকের প্রভাবে জীবের অবিরত সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রিত স্থানিক চলন বা ওরিয়েন্টেশন। ট্যাক্সিসের প্রধান শর্ত হলো **প্রাণীর স্থান পরিবর্তন**। Tinbergen (1951), Herter (1927), Cellyot (1936) প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ প্রাণীর ট্যাক্সিস নিয়ে গবেষণা করেছেন।

ট্যাক্সিসের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Taxis)

(১) ট্যাক্সিস সর্বদা বাহ্যিক উদ্দীপক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। (২) এটি সহজাত আচরণ। (৩) জীব অপরিবর্তনীয় সাড়া প্রদান করে। (৪) প্রাণীর দেহের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে শুধু উদ্দীপকের উৎসের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে। (৫) প্রাণীর সমগ্র দেহের ওরিয়েন্টেশন ঘটে। (৬) উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া পজেটিভ বা নেগেটিভ হতে পারে। (৭) শুধু চলনশীল জীবের ক্ষেত্রে এটি ঘটে থাকে এবং জীব নিজে এটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

ট্যাক্সিসের প্রকারভেদ (Kinds of Taxis)

(ক) উদ্দীপক ও গ্রাহক অঙ্গের (receptors) সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে ট্যাক্সিসকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়–

১। **ট্রোপোট্যাক্সিস (Tropotaxis) :** কোনো প্রাণীর একাধিক রিসেপ্টর যখন কোনো উদ্দীপকের উদ্দীপনা গ্রহণ করে এবং একই সঙ্গে ভারসাম্যমূলক প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে স্থানান্তরিত হয় তখন তাকে **ট্রোপোট্যাক্সিস** বলে।

যেমন– Crustacea শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত *Armadillium* নামক পোকার ওপর ফটোট্রোপোট্যাকটিক (phototropotactic) গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে যে, এদের যেকোনো একপাশের চোখ অন্ধ করে দিলে এরা ভারসাম্য হারিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। অথবা, ক্ষুধার্ত *Planaria* খাদ্যের ঘ্রাণবাহী পানি স্রোতের প্রতি ধনাত্মক ট্রোপোট্যাক্সিস প্রদর্শন করে। অপরপক্ষে, পরিতৃপ্ত অবস্থায় এরা আলোক উৎস থেকে পালিয়ে পাথরের নিচে বা গাছের গুঁড়ির নিচে লুকায়, অর্থাৎ ঋণাত্মক ট্রোপোট্যাক্সিস প্রদর্শন করে। এ ধরনের ট্যাক্সিস মাছের উকুনেও (Fish louse) দেখা যায়।

২। **টেলোট্যাক্সিস (Telotaxis) :** যখন কোনো প্রাণী তার গ্রাহক অঙ্গের (receptor) মাধ্যমে একাধিক উদ্দীপকের মধ্য থেকে যেকোনো একটির দিকে ধাবিত হয় তখন তাকে **টেলোট্যাক্সিস** বলে।

যেমন– সন্ন্যাসী কাঁকড়াকে (Hermit crab) দুটি আলোক উৎস (মৃদু ও উজ্জ্বল) দ্বারা উদ্দীপিত করলে এরা সর্বদাই একটি উৎসের দিকে অর্থাৎ উজ্জ্বল আলোর দিকে গমন করে। কখনো মধ্যবর্তী পথে অগ্রসর হয় না। এ ধরনের ট্যাক্সিস মৌমাছিতেও দেখা যায়।

৩। **ক্লিনোট্যাক্সিস (Klinotaxis) :** কোনো প্রাণী যখন একটি বিশেষ গ্রাহক অঙ্গের (receptor organ) দ্বারা একাধিক উদ্দীপকের তীব্রতার তুলনা করে উদ্দীপ্ত হয় এবং গমন করে তখন তাকে ক্লিনোট্যাক্সিস বলা হয়। এক্ষেত্রে প্রাণী তার সংবেদী অঙ্গের (receptor) দ্বারা সবদিকের উদ্দীপনা সমানভাবে গ্রহণ না করে গ্রাহক অঙ্গ এপাশ-ওপাশ ঘুরিয়ে তীব্রতার মধ্যে তুলনা করে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে এই তুলনার মাধ্যমেই প্রাণী স্থানান্তরিত হতে থাকে। যেমন– *Musca, Calliphora, Lucilia* ইত্যাদি মাছির ম্যাগোট (Maggot) পিউপা দশায় পদার্পণের পূর্বে আলোর প্রতি এরূপ ওরিয়েন্টেশন দেখায়।

৪। **মেনোট্যাক্সিস (Menotaxis) :** উদ্দীপকের উৎসের গতিপথের সাথে নির্দিষ্ট কৌণিক দূরত্ব বজায় রেখে যখন প্রাণী উৎসের দিকে এগিয়ে চলে, তখন তাকে **মেনোট্যাক্সিস** বলে। যেমন– মৌমাছি, পিঁপড়া ইত্যাদি পতঙ্গের গৃহে প্রত্যাবর্তনের (home ward) জন্য আলোর দিকদর্শন প্রতিক্রিয়া (light compass reaction)।

৫। **নেমোট্যাক্সিস (Nemotaxis) :** প্রাণীরা অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে স্মৃতির ওপর নির্ভর করে যে ওরিয়েন্টেশন ঘটায় তাকে **নেমোট্যাক্সিস** বলে। যেমন– পিপীলিকা, *Neomys fodiens* নামক জলজ প্রাণী ইত্যাদির বাসায় ফেরা। উদাহরণস্বরূপ আরও বলা যায়, শিশুরা কবিতা বা ছড়া আবৃতির সময় হঠাৎ কোনো অংশ ভুলে গেলে কয়েক লাইন পূর্ব থেকে শুরু করে ভুলে যাওয়া অংশ স্মৃতিতে নিয়ে আবৃতি শেষ করে।

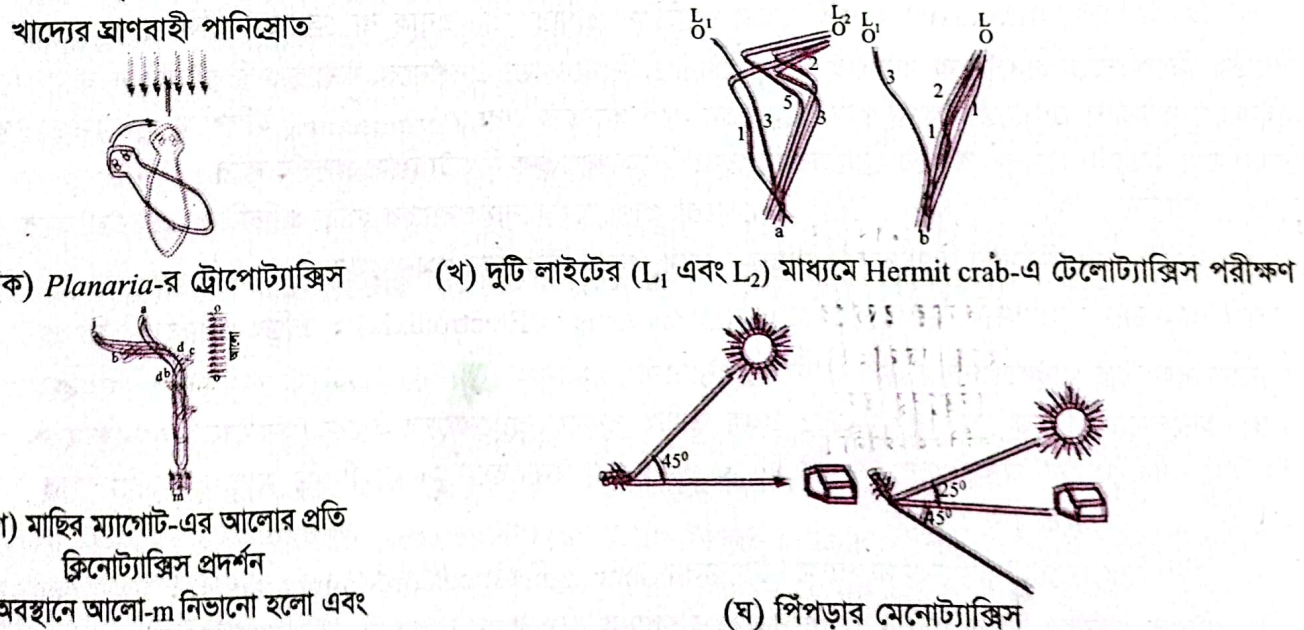

(ক) *Planaria*-র ট্রোপোট্যাক্সিস

(খ) দুটি লাইটের (L_1 এবং L_2) মাধ্যমে Hermit crab-এ টেলোট্যাক্সিস পরীক্ষণ

(গ) মাছির ম্যাগোট-এর আলোর প্রতি ক্লিনোট্যাক্সিস প্রদর্শন (d অবস্থানে আলো-m নিভানো হলো এবং আলো o জ্বালানো হলো)

(ঘ) পিঁপড়ার মেনোট্যাক্সিস

চিত্র ১২.৭ : বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্সিস

(খ) উদ্দীপকের ধরন বা উদ্দীপনার উৎসের ওপর নির্ভর করে ট্যাক্সিসকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়–

১। ফটোট্যাক্সিস (Phototaxis) : এই প্রকার ট্যাক্সিসে প্রাণীরা আলোক উৎসের প্রতি সাড়া প্রদর্শন করে। অর্থাৎ আলোক উৎসের প্রতি প্রাণীর আকর্ষণ (ধনাত্মক) বা বিকর্ষণকে (ঋণাত্মক) বোঝায়। যেমন– *Paramecium*, মাছি, উইপোকা, *Euglena* ইত্যাদিতে ধনাত্মক ফটোট্যাক্সিস এবং কেঁচো, তেলাপোকা, *Planaria*, ইত্যাদিতে ঋণাত্মক ফটোট্যাক্সিস লক্ষ করা যায়।

২। থার্মোট্যাক্সিস (Thermotaxis) : এই প্রকার ট্যাক্সিসে প্রাণীরা তাপীয় উদ্দীপনার প্রতি সাড়া প্রদর্শন করে থাকে। যেমন– *Amoeba, Euglena, Paramecium* ইত্যাদি প্রাণী অধিক তাপমাত্রায় (২০-২৮°C-এর বেশি) ঋণাত্মক থার্মোট্যাক্সিস প্রদর্শন করে। এটি ছাড়াও মানুষের দিকে ছারপোকার গমন ধনাত্মক থার্মোট্যাক্সিস এবং কুনোব্যাঙের শীতনিদ্রায় গমন ঋণাত্মক থার্মোট্যাক্সিসের অন্তর্ভুক্ত।

৩। কেমোট্যাক্সিস (Chemotaxis) : এই প্রকার ট্যাক্সিসে প্রাণীরা রাসায়নিক দ্রব্যের প্রতি সাড়া প্রদর্শন করে থাকে। যেমন– *Amoeba* গাঢ় ক্ষার দ্রবণ ও চিনি দ্রবণে এবং *Paramecium* বেশিরভাগ রাসায়নিক দ্রব্যের প্রতি ঋণাত্মক কেমোট্যাক্সিস প্রদর্শন করে, কিন্তু হালকা অম্ল স্বাদযুক্ত পদার্থের প্রতি ধনাত্মক কেমোট্যাক্সিস প্রদর্শন করে।

৪। অ্যারোট্যাক্সিস (Aerotaxis) : এই প্রকার ট্যাক্সিসে প্রাণীরা অক্সিজেনের ঘনত্বের পার্থক্যের কারণে সাড়া দেয়।

৫। এনার্জি ট্যাক্সিস (Energy taxis) : এই প্রকার ট্যাক্সিসে প্রাণীরা কোষের অন্তঃস্থ শক্তির অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ বিপাকীয় কাজের দিকে সাড়া দেয়।

৬। থিগমোট্যাক্সিস (Thigmotaxis) : এই প্রকার ট্যাক্সিসে কোনো প্রাণী তার স্বাভাবিক চলার পথে স্পর্শ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় অর্থাৎ স্পর্শানুভূতির প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। যেমন– *Paramecium* চলার পথে কোনো কঠিন বস্তুর সংস্পর্শে এলে সে প্রথমে থেমে যায় তারপর গতিপথ পরিবর্তন করে ঋণাত্মক থিগমোট্যাক্সিস দেখায়। মানুষের ক্ষেত্রে নারী পুরুষকে স্পর্শ করলে ধনাত্মক এবং বিদ্যুৎ স্পর্শ করলে ঋণাত্মক থিগমোট্যাক্সিস প্রদর্শন করে।

৭। হাইড্রোট্যাক্সিস (Hydrotaxis) : এই প্রকার ট্যাক্সিসে প্রাণী পানি বা আর্দ্রতার প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। যেমন– কেঁচো সর্বদা আর্দ্র মাটির দিকে গমন করে।

৮। জিওট্যাক্সিস বা গ্র্যাভিট্যাক্সিস (Geotaxis or Gravitaxis) : কোনো প্রাণীর মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রতি সাড়া প্রদর্শনকে জিওট্যাক্সিস বা গ্র্যাভিট্যাক্সিস বলা হয়। এই বলের দিকে ও বিপরীতের ট্যাক্সিসকে যথাক্রমে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক জিওট্যাক্সিস বলা হয়। যেমন– Catterpilar-এর লার্ভা খাদ্যের সন্ধানে গাছের উপরের দিকে এবং পিউপা তৈরির প্রাক্কালে নিচের দিকে নেমে যথাক্রমে ঋণাত্মক ও ধনাত্মক জিওট্যাক্সিস প্রদর্শন করে। *Paramecium* ও জিওট্যাক্সিস প্রদর্শন করে।

৯। রিওট্যাক্সিস (Rheotaxis) : এই প্রকার ট্যাক্সিসে প্রাণীরা পানিপ্রবাহ বা স্রোতের প্রতি সাড়া প্রদর্শন করে। স্রোতের দিকে সাড়া প্রদর্শনকে ধনাত্মক এবং বিপরীত দিকে সাড়া প্রদর্শনকে ঋণাত্মক রিওট্যাক্সিস বলে। যেমন– অধিকাংশ প্ল্যাঙ্কটন ও মাছের পোনা পানির স্রোতের সঙ্গে ধনাত্মক এবং *Paramecium*, ইলিশ মাছ, কার্পজাতীয় মাছ, স্যামন মাছ ইত্যাদি প্রজনন ঋতুতে স্রোতের বিপরীত দিকে ঋণাত্মক রিওট্যাক্সিস প্রদর্শন করে।

১০। অ্যানিমোট্যাক্সিস (Anemotaxis) : কোনো প্রাণী যখন বায়ুপ্রবাহের প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে চলাচল করে তখন তাকে অ্যানিমোট্যাক্সিস বলে। যেমন– পাখি, পতঙ্গ ইত্যাদির গমনাগমন।

১১। গ্যালভানোট্যাক্সিস বা ইলেক্ট্রোট্যাক্সিস (Galvanotaxis or Electrotaxix) : তড়িৎ প্রবাহের প্রতি প্রাণীর সাড়া প্রদর্শনকে বলা হয় গ্যালভানোট্যাক্সিস বা ইলেক্ট্রোট্যাক্সিস। যেমন– *Paramecium*-কে মৃদু তড়িৎ প্রবাহের আওতায় আনলে ক্যাথোডের দিকে (ঋণাত্মক) এবং প্রবল তড়িৎ প্রবাহে অ্যানোডের দিকে (ধনাত্মক) গমন করে। আবার, চিংড়ি মাছধারী কোনো অ্যাকুরিয়ামে দুর্বল তড়িৎ প্রবাহ চালানো হলে সকল চিংড়ি মাছ অ্যাকুরিয়ামের অ্যানোড (ধনাত্মক) প্রান্তের দিকে ছুটতে থাকে।

১২। জিওম্যাগনেটোট্যাক্সিসবা ম্যাগনেটোট্যাক্সিস (Geomagnetotaxis or Magnetotaxis) : যখন কোনো প্রাণী পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের উপর প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে চলাচল করে তখন তাকে জিওম্যাগনেটোট্যাক্সিস বলা হয়। যেমন– পাখির অভিপ্রয়াণ (migration) সঠিক পথে চলতে এই উদ্দীপনা কাজ করে থাকে।

১৩। **ফনোট্যাক্সিস** (Phonotaxis) : যখন কোনো প্রাণী শব্দের প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে চলাচল করে তখন তাকে **ফনোট্যাক্সিস** বলে। পানিতে শব্দ সৃষ্টি করলে কিছু মাছ ধনাত্মক আবার কিছু মাছ ঋণাত্মক ফনোট্যাক্সিস প্রদর্শন করে।

১৪। **স্টেরোট্যাক্সিস** (Sterotaxis) : কোনো প্রাণীর সমতল ও মসৃণতলে সাড়া প্রদান করে চলাচলকে বলা হয় **স্টেরোট্যাক্সিস**। যেমন– ইঁদুর, টিকটিকি ইত্যাদি প্রাণী মসৃণ প্রাচীরের কিংবা ছাদের সিলিং বেয়ে চলতে পারে। এরূপ চলাচলকে ধনাত্মক স্টেরোট্যাক্সিস বলে।

১৫। **সাপেক্ষ ট্যাক্সিস** (Conditional taxis) : একই সময়ে যখন কোনো প্রাণী দুই বা ততোধিক ট্যাক্সিস প্রদর্শন করে তখন তাকে **সাপেক্ষ ট্যাক্সিস** বলে। যেমন– কিছু প্রজাপতি ডিম পাড়ার জন্য বিশেষ উদ্ভিদের গন্ধ ও সবুজ পাতার দিকে গমন করে।

১৬। **হেলিওট্যাক্সিস** (Heliotaxis) : যখন কোনো প্রাণী আলোর উৎস হতে দূরে যায় না কিন্তু ছায়া পছন্দ করে, তখন তাদের এরূপ আচরণকে **হেলিওট্যাক্সিস** বলে।

দেহের দিকমুখিতার ভিত্তিতে ট্যাক্সিসকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়–

১। **ধনাত্মক বা পজেটিভ ট্যাক্সিস (Positive taxis)** : এক্ষেত্রে প্রাণী উদ্দীপকের উৎসের দিকে গমন করে বা ঘুরে যায়।

২। **ঋণাত্মক বা নেগেটিভ ট্যাক্সিস (Negetive taxis)** : এক্ষেত্রে প্রাণী উদ্দীপকের উৎস থেকে দূরে সরে যায়।

ট্যাক্সিসের গুরুত্ব (Importance of Taxis) : ট্যাক্সিস প্রাণীদের এক ধরনের স্বয়ংক্রিয় এবং সরল অভিযোজনিক আচরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেমন– প্রজাপতির দিকমুখিতা ও চলন শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে। পিঁপড়া ও পাখির বাসায় ফেরার বিষয়টি ট্যাক্সিসের নিয়মে পরিচালিত হয় এবং ঋণাত্মক ফটোট্যাক্সিসের ফলে মাছির লার্ভা অন্ধকার কোণে পিউপায় রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগ পায়। এক কথায় বলতে গেলে, উদ্দীপনায় যথাসময়ে সঠিক সাড়া দিয়ে প্রাণী বংশবৃদ্ধি থেকে শুরু করে নীড় নির্মাণ, অপত্য যত্ন, আহার সংগ্রহ, শত্রুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে নির্বংশ হওয়া থেকে টিকে থাকে। অর্থাৎ এ ধরনের আচরণ প্রাণীদের টিকে থাকতে বা অভিযোজিত হতে সহায়তা করে।

১২.২.২ : প্রতিবর্তী ক্রিয়া (Reflexes)

বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ আকস্মিক উদ্দীপনায় (সংজ্ঞাবহ) প্রাণিদেহে যে দ্রুত, স্বতঃস্ফূর্ত (spontaneous) **ও অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তাকে প্রতিবর্তী ক্রিয়া** (reflexes) **বলা হয়**। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো উদ্দীপকের প্রতি প্রাণীর ইচ্ছাধীন নয় এমন স্বতঃস্ফূর্ত, স্বয়ংক্রিয় ও যান্ত্রিক সাড়া প্রদানকে প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে। বিজ্ঞানী **Sherrington** (১৭৮৯) সর্বপ্রথম প্রতিবর্তী ক্রিয়া নামটি প্রবর্তন করেন। স্নায়ুতন্ত্রের অধিকাংশ কর্মকাণ্ডই সাধারণত **মস্তিষ্ক** (brain) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে এ ধরনের ক্রিয়া মস্তিষ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে **সুষুম্নাকাণ্ড** (spinal cord) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদাহরণ–

১। চোখে কোনো কিছু পড়লে আপনা থেকেই চোখ বন্ধ হয়ে যাওয়া।

২। খাদ্যদ্রব্যের ঘ্রাণে লালা ক্ষরণ হওয়া।

৩। হঠাৎ তীব্র আলোয় চোখের পিউপিল ছোট হয়ে আসা।

৪। হঠাৎ পায়ে কাঁটা ফুটলে পা-টি তৎক্ষণাৎ সরিয়ে নেওয়া।

৫। দেহের কোন অংশ কোনো গরম বস্তুর নিকটে গেলে যেমন– জ্বলন্ত আগুনের নিকটে হাত বা পা চলে গেলে হাত বা পা টি তাৎক্ষণিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে আগুনের শিখা থেকে দূরে সরে যায়।

৬। ঘুমন্ত অবস্থায় হাতের ওপর মশা কামড়ালে হাত সরে আসা ইত্যাদি।

চিত্র ১২.৮ : হঠাৎ তাপের সংস্পর্শে পা সরানোর দৃশ্য

উল্লেখ্য যে, বেশিরভাগ প্রতিবর্তী ক্রিয়া সুষুম্নাকাণ্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও, কিছু কিছু জটিল প্রতিবর্তী ক্রিয়া কেবল **সুষুম্নাকাণ্ড** দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে **মস্তিষ্কের** সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন– সাইকেল চালানো, সার্কাসে দড়ির উপর খেলা দেখানো ইত্যাদি।

প্রতিবর্তী ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Reflexes)

(১) সাধারণত অধিকাংশ প্রতিবর্তী ক্রিয়াই সরল প্রকৃতির কারণ একটি উদ্দীপকের প্রয়োগ দ্বারা মাত্র একটি প্রতিক্রিয়া ঘটে। (২) সংবেদনমূলক উদ্দীপকের মাধ্যমে এ ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। (৩) এই ক্রিয়া অনৈচ্ছিক, স্বয়ংক্রিয় (automatic), স্বতঃস্ফূর্ত এবং সহজাত (innate) বা জন্মগত, শিক্ষালব্ধ (instactive) নয়। (৪) এই ক্রিয়া অতি দ্রুত সম্পন্ন হয় অর্থাৎ সংবেদনের সাথে সাথেই প্রতিক্রিয়া বা দৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। (৫) এই ক্রিয়া প্রাণীর আত্মরক্ষাসহ অন্যান্য কাজে (আকস্মিক দুর্ঘটনা, মস্তিষ্কের অতিরিক্ত কাজের চাপ ইত্যাদি) সহায়ক ভূমিকা পালন করে। (৬) উদ্দীপক দ্বারা সার্বক্ষণিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার প্রয়োজন হয় না। (৭) এই ক্রিয়া সহজে সংশোধিত বা পরিবর্তিত হয় না। (৮) এর পিছনে কেনো পূর্ব পরিকল্পনা থাকে না।

প্রতিবর্তী ক্রিয়া সংঘটন প্রক্রিয়া (Process of Reflexes)

যে স্নায়ুপথে প্রতিবর্তী ক্রিয়ার স্নায়ুর উদ্দীপনা আবর্তিত হয় বা ঘটে তাকে **প্রতিবর্ত চক্র** বা **প্রতিবর্ত চাপ** (reflex arc) বলে। প্রতিবর্তী চক্রের অংশগুলো হলো–

১। **গ্রাহক** (Receptor) : এটি প্রতিবর্তী ক্রিয়ার জন্য পরিবেশ হতে আগত সংবেদী উদ্দীপনা গ্রহণ করে। এর সঙ্গে একটি সংবেদী স্নায়ু যুক্ত থাকে।

২। **অন্তর্বাহী পথ** (Afferent path) : এটি একটি সংবেদী স্নায়ু (sensory nerve) এর মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা গ্রাহক অঙ্গ (receptor) থেকে **স্নায়ুকেন্দ্রে বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে** (central nervous system) পৌঁছায়।

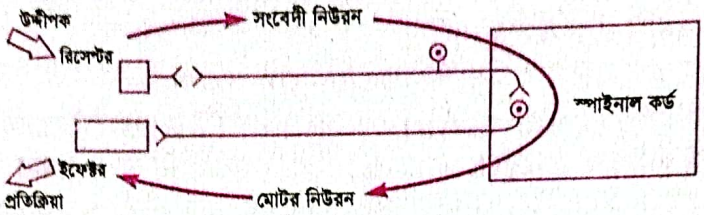

চিত্র ১২.৯ : মনোসিনাপটিক প্রতিবর্ত চক্রের উপাদান

৩। **স্নায়ুকেন্দ্র** (Nerve center) : এটি প্রকৃতপক্ষে সুষুম্নাকাণ্ডের **গ্রে-ম্যাটারে** অবস্থিত একটি সাইন্যাপস (synaps) যার মাধ্যমে অন্তর্বাহী স্নায়ু উদ্দীপনা (অর্থাৎ সংবেদী উদ্দীপনা) মোটর নিউরনে পরিবাহিত হয়ে চেষ্টীয় (motor) উদ্দীপনায় রূপান্তরিত হয়।

৪। **বহির্বাহী পথ** (Efferent path) : এটি একটি চেষ্টীয় স্নায়ু (motor nerve)। এর মাধ্যমে বহির্গামী স্নায়ু উদ্দীপনা (চেষ্টীয় উদ্দীপনা) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে **প্রভাবিত অঙ্গে** (effector) প্রেরিত হয় বা পৌঁছায়।

৫। **প্রভাবিত অঙ্গ** (Effector) : এই স্থানে স্নায়ু-উদ্দীপনা সমাপ্ত হয়। এটি একটি পেশি বা গ্রন্থি হতে পারে, যা সংকোচন বা নিঃসরণের মাধ্যমে প্রতিবর্তী ক্রিয়ার প্রভাব প্রদর্শন করে।

প্রতিবর্তী ক্রিয়ার পরীক্ষা (Experiment of Reflexes)

প্রতিবর্তী ক্রিয়ার স্নায়ুপ্রবাহ কীভাবে ঘটে তা একটি পরীক্ষার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো। হঠাৎ জ্বলন্ত কাঠিতে হাত দেওয়া হলে হাতটি তৎক্ষণাৎ জ্বলন্ত কাঠি থেকে সরে যায়। হাতের ত্বকে অবস্থিত গ্রাহক (receptors) কোষগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে সংবেদী স্নায়ুর (sensory nerve) মাধ্যমে স্নায়ু সংবেদনকে সুষুম্নাকাণ্ডে (spinal cord) প্রেরণ করে। সুষুম্নাকাণ্ড থেকে সাড়া (response) চেষ্টীয় স্নায়ুর (motor nerve) মাধ্যমে হাতের ফ্লেক্সর (flexor) পেশিগুলোতে পৌঁছালে তারা উদ্দীপিত ও সংকুচিত হয়। ফলে হাতটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে সরে আসে।

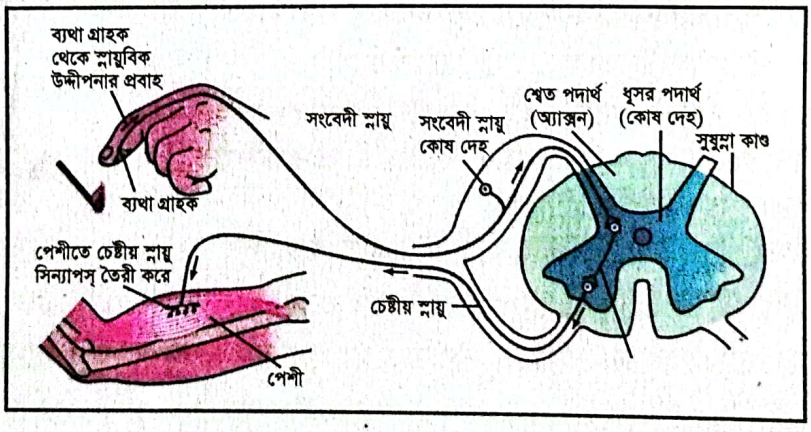

চিত্র ১২.১০ : প্রতিবর্তী ক্রিয়া সংঘটন।

প্রতিবর্তী ক্রিয়ার প্রকারভেদ (Classification of Reflexes) : প্রতিবর্তী ক্রিয়াকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নলিখিত তিন ভাগে ভাগ করা যায়–

(ক) সহজাত বা অনপেক্ষ বা সরল প্রতিবর্তী ক্রিয়া (Unconditional or Inborn or Simple Reflexes) : যেসব প্রতিবর্তী ক্রিয়া জন্মগত, স্থির এবং কোনো শর্তাধীন নয় তাদের সহজাত বা অনপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে।

উদাহরণ : (১) খাদ্যের গন্ধে বা দর্শনে লালা নিঃসরণ হওয়া। (২) শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্তনপান। (৩) উজ্জ্বল আলোতে তারা রন্ধ্রের সংকোচন। (৪) হঠাৎ পায়ে কাঁটা বিঁধলে সঙ্গে সঙ্গে পায়ের পাতা মাটি থেকে তুলে নেওয়া ইত্যাদি।

সহজাত প্রতিবর্তী ক্রিয়ার প্রকারভেদ (Types of Unconditional Reflexes)

(a) সংজ্ঞাবহ উদ্দীপনার উৎপত্তি অনুসারে সহজাত প্রতিবর্তী ক্রিয়া ৩ ধরনের। যথা–

১। **সুপারফিসিয়াল বা উপরিগত প্রতিবর্তী ক্রিয়া** (Superficial reflex) : এক্ষেত্রে উদ্দীপনা ত্বক বা চামড়া থেকে গৃহীত হয় (চিত্র ১২.৮)। যেমন– প্লান্টার রিফ্লেক্স (planter reflex)।

২। **ডিপ বা গভীর প্রতিবর্তী ক্রিয়া** (Deep reflex) : এক্ষেত্রে উদ্দীপনা গভীরে কণ্ডরা বা টেন্ডন থেকে গৃহীত হয়। ফলে কণ্ডরা সংলগ্ন পেশিটি সংকুচিত হয়। যেমন– হাঁটু ঝাঁকুনি (knee jerk)।

ডিপ বা গভীর প্রতিবর্তী ক্রিয়ার কার্যপদ্ধতি : হাতুড়ি বা হেমার দিয়ে হাঁটুর নিচে কোয়াড্রিসেপস পেশির টেন্ডনে আঘাত করতে হয়। এখান থেকে উদ্দীপনা সংবেদী স্নায়ুর মাধ্যমে সুষুম্নাকাণ্ডে পৌঁছায়। সুষুম্নাকাণ্ড চেষ্টীয় স্নায়ুর মাধ্যমে কোয়াড্রিসেপস পেশিতে সংকোচনের জন্য নির্দেশ পাঠায়, ফলে পায়ের সামনের দিকে প্রসারণ হয়। একেই হাঁটু ঝাঁকুনি (knee jerk) বলে। হাঁটুর পেশি স্পিন্ডল থেকে উদ্দীপনা অন্তর্মুখী নিউরন (afferent neuron)-এর মাধ্যমে সুষুম্নাকাণ্ডে পৌঁছায়। সুষুম্নাকাণ্ড থেকে চেষ্টীয় নির্দেশ বহির্মুখী নিউরনের (efferent neuron) মাধ্যমে পেশিতে পৌঁছায়। এর ফলে পেশি সংকুচিত হয়।

চিত্র ১২.১১: উপরিগত প্রতিবর্ত বা প্লান্টার রিফ্লেক্স

চিত্র ১২.১২ : হাঁটু ঝাঁকুনি

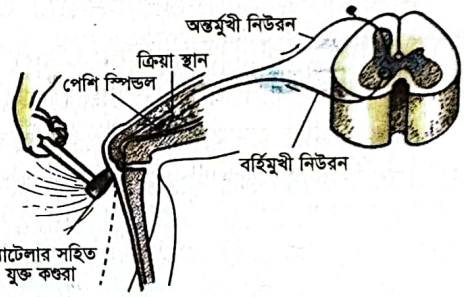

চিত্র ১২.১৩ : হাঁটু ঝাঁকুনির পথ

৩। **ভিসেরাল বা আন্তঃযন্ত্রীয় প্রতিবর্তী ক্রিয়া** (Viseral reflex) : এ ধরনের প্রতিবর্তী ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় এবং দেহস্থ আন্তঃযন্ত্রসমূহ থেকে উৎপন্ন হয়। যেমন– ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, মূত্রাশয়, পাকস্থলী, অন্ত্র ইত্যাদির প্রতিবর্তী ক্রিয়া।

(b) প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সংঘটনের পথে সাইন্যাপসের সংখ্যানুযায়ী সহজাত প্রতিবর্তী ক্রিয়া ২ ধরনের। যথা–

১। **মনোসাইন্যাপটিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া** (Monosynaptic reflexes) : প্রতিবর্ত সংঘটন পথে একটি সাইন্যাপস থাকে। যেমন– অ্যাঙ্কলের (ankle) ঝাঁকুনি।

২। **পলিসাইন্যাপটিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া** (Polysynaptic reflexes) : প্রতিবর্ত সংঘটন পথে একাধিক সাইন্যাপস থাকে। যেমন– গরম পাত্রে হাত লাগলে দ্রুততার সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে হাত অন্যত্র নিরাপদ স্থানে সরে যায়।

(খ) অর্জিত বা সাপেক্ষ বা জটিল প্রতিবর্তী ক্রিয়া (Acquired or Conditioned or Complex Reflexes) : যেসব প্রতিবর্তী ক্রিয়া জন্মগত নয়, বার বার অনুশীলনের ফলে অর্জিত হয় এবং শর্তসাপেক্ষ, তাদের **অর্জিত বা সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া** বলে। **উদাহরণ**– পরিচিত টক খাবারের কথা শুনলে মুখে লালা আসে; কিন্তু অপরিচিত টক খাবার দেখলেও লালা আসে না।

অর্জিত প্রতিবর্তী ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Acquired Reflexes)

(১) এটি অর্জিত। (২) এটি পূর্বের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে। (৩) এটি স্থায়ী হতে পারে আবার অবলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। (৪) এটি বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয় না। (৫) এই প্রকার প্রতিবর্তী ক্রিয়ার জন্য সেরিব্রাম ও গুরুমস্তিষ্কের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন, অর্থাৎ এই প্রকার প্রতিবর্তী ক্রিয়া জটিল। (৬) সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া প্রাথমিকভাবে কোনো অনপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল।

(গ) ক্রমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া (Chained Reflexes) : একাধিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া যখন পর্যায়ক্রমে যুক্ত হয়ে একটি সরল প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং দ্বিতীয় আবার তৃতীয় আর একটি সরল প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সৃষ্টি করে তখন এরকম জটিল ক্রিয়াকে ক্রমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলা হয়। যেমন– কোনো কিছুর ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে লাগাতে ভীষণ হাঁচি শুরু হয়ে যায় এবং হাঁচি দিতে দিতে চোখে পানি এসে যায়।

❑ **কাজ :** প্রতিবর্তী ক্রিয়া কোন ধরনের আচরণ? ব্যাখ্যা কর।

১২.২.৩ : সহজাত আবেগ বা ইনসটিংক্টস (Instincts)

ল্যাটিন শব্দ *instinctus* থেকে instinct শব্দটির উৎপত্তি, যার অর্থ সহজাত ধারণা বা সহজাত আবেগ বা প্রবৃত্তি। আর এই প্রবৃত্তি থেকেই ক্রিয়ার উৎপত্তি। কোনো একটি প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রাণী কোনো রকম শিক্ষা বা পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদে বংশপরম্পরায় একইভাবে যেসব জন্মগত, অপরিবর্তনীয়, আচরণ প্রদর্শন করে অর্থাৎ জন্মগত প্রবৃত্তি প্রকাশ করে তাই **সহজাত আবেগ বা সহজাত প্রবৃত্তির** (instinct) অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সহজাত আবেগই হলো সহজাত আচরণ এবং বলা যায়, এরা পরস্পরের সমার্থক শব্দ।

সহজাত আবেগ প্রাণী জন্মসূত্রে পেয়ে থাকে। কারণ প্রতিটি প্রাণীই জন্মের সময় কতকগুলো সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) এবং প্রতিবর্তী ক্রিয়ার (reflex action) ক্ষমতা লাভ করে থাকে। যেমন– পাখির বাসা বাঁধার প্রবৃত্তি, মাকড়সার জাল বোনার প্রবৃত্তি, মৌমাছির চাক তৈরির প্রবৃত্তি ইত্যাদি। এর মধ্যে টুনটুনি পাখির বাসা বাঁধা এবং সদ্যোজাত হেরিংগাল ও তার মায়ের মধ্যে পারস্পরিক সাড়া সহজাত আবেগ বা ইনসটিংক্ট এর চমৎকার উদাহরণ।

চিত্র ১২.১৪ : টুনটুনির বাসা তৈরি

বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, সহজাত আবেগ হচ্ছে এক প্রকার শক্তি, যা নিসর্গ দ্বারা পরিচালিত হয়। Darwin (1859) সর্বপ্রথম সহজাত আবেগের বাস্তবমুখি একটি সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেন।

তাঁর সংজ্ঞা অনুযায়ী, এটি প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে গড়ে উঠা এক জটিল প্রতিবর্তী। Darwin এর মতে উত্তরাধিকার সূত্রের মাধ্যমে আগত সাড়াদানের প্রক্রিয়ায় সহজাত আবেগের প্রকাশ ঘটে।

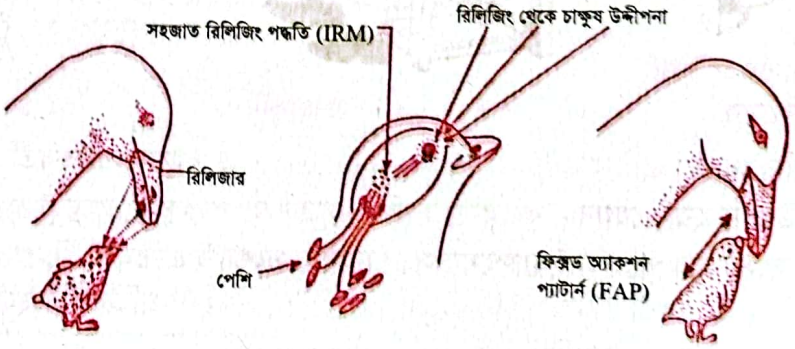

চিত্র ১২.১৫ : রিলিজারের সঙ্গে IRM ও FAP এর সম্পর্ক

Lorenz (1937) ডারউইনের বক্তব্যের সাথে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করে বলেন যে, প্রত্যেক প্রাণিপ্রজাতির আচরণ কতকগুলো **স্থায়ী অ্যাকশন প্যাটার্ন** (Fixed Action Pattern-FAP) নিয়ে গঠিত। FAP হচ্ছে প্রজাতি-নির্দিষ্ট অথবা জিনগতভাবে নির্ধারিত। তিনি আরও বলেন, প্রতিটি FAP-ই সহজাত আচরণ এবং প্রাণিদেহে অনেক সহজাত আবেগ কেন্দ্র রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, সদ্যোজাত **হেরিংগাল** ও তার মায়ের মধ্যে প্রদর্শিত সাড়া। ক্ষুধার্ত হেরিংগাল ছানা চাক্ষুষ উদ্দীপনার প্রতি সংবেদনশীল। অন্যদিকে, বাসায় ছানার উপস্থিতি পূর্ণাঙ্গ হেরিংগাল-এ (visual stimuli) হিসেবে কাজ করে। রিলিজিং উদ্দীপনার মাধ্যমে যে বার্তার সৃষ্টি হয় তা অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের একটি কেন্দ্রে বাহিত হয়। এ কেন্দ্রই সুনির্দিষ্ট বার্তার প্রতি নির্দিষ্ট সাড়া দেয়। এ প্রক্রিয়াটি **সহজাত রিলিজিং পদ্ধতি** (Innate Releasing Mechanism-IRM)। IRM নির্দিষ্ট পেশিকে সংকোচন ও প্রসারণের নির্দেশ দেয়। ফলে ছানার ঠোকর পড়ে পূর্ণাঙ্গ হেরিংগালের ঠোঁটে অবস্থিত লাল ফোঁটার ওপর। এটাই হচ্ছে **স্থায়ী অ্যাকশন প্যাটার্ন** (FAP)।

FAP এর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of FAP) : Lorenz (1932) প্রদত্ত মানদণ্ড অনুযায়ী একটি FAP কে অবশ্যই নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হতে হবে।

(১) **ছাঁচসম্মত (Stereotype) :** আচরণে কোনো সময় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না, সব সময় আচরণ একই থাকে। (২) **সার্বজনীনতা :** একটি প্রজাতির সকল সদস্যে এ আচরণ প্রদর্শিত হবে। (৩) **উদ্দেশ্যের একনিষ্ঠতা :** একটি মাত্র কাজ করে। (৪) **ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বহির্ভূত :** পরস্পর পৃথক অবস্থায় থাকলেও প্রজাতির সব সদস্য একই আচরণ প্রকাশ করে। (৫) **ব্যালিসটিকনেস (Ballisticness) :** একবার সাড়া দেওয়া হলে পরিস্থিতির পরিবর্তন হলেও তা পরিবর্তন হয় না।

প্রতিবর্তী ক্রিয়া ও সহজাত আচরণের পার্থক্য

প্রতিবর্তী ক্রিয়া	সহজাত আচরণ (সহজাত আবেগ)
১। মেরুদণ্ডীদের ক্ষেত্রে এ ক্রিয়া মেরুরজ্জু (nerve cord) কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।	১। এটি মস্তিষ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।
২। এটি সরল প্রকৃতির এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রতি তাৎক্ষণিক দ্রুতগতিতে সাড়া দেয়।	২। এটি জটিল প্রকৃতির এবং ধীর গতিতে বিকশিত হয়।
৩। এটি অনেকসময় প্রাণীর ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করা যায়।	৩। এটি কখনোই প্রাণীর ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করা যায় না।
৪। প্রতিবর্তী ক্রিয়া বুদ্ধিপ্রসূত নয়।	৪। সহজাত আচরণের মধ্যে বুদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট।
৫। প্রতিবর্তী ক্রিয়া যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হওয়ায় এর কাজ সর্বক্ষেত্রে একই রকম এবং এটা অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তিত হয় না।	৫। এটি অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তিত হয়।
৬। প্রতিবর্তী ক্রিয়া আত্মরক্ষামূলক।	৬। এটি আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষামূলক আচরণ।
৭। জৈবনিক সব প্রয়োজন মেটাতে অপরিহার্য নয়।	৭। জৈবনিক সব প্রয়োজন মেটাতে এটি অপরিহার্য।

১২.৩ প্রত্যেক প্রাণীর সহজাত আচরণ যাচাই (Experiment of Innate Behaviour)

বিভিন্ন ধরনের উদাহরণের সাহায্যে সহজাত আচরণ যাচাই করা যায়। যেমন– পাখির মাইগ্রেশন, মাকড়সার জাল বুনন, বিভিন্ন প্রাণীর অপত্যের প্রতি যত্ন, প্রাণীদের প্রণয় ও সঙ্গম আচরণ, খাদ্যান্বেষণ, বাসা তৈরি করা, খাদ্য মজুদ করা, নৃত্য করা, মৌমাছির চাক তৈরি ইত্যাদি। নিচে সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত সহজাত আচরণ যাচাইয়ের কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো–

(ক) শীতের পাখির মাইগ্রেশন (Migration of Winter Birds)

ল্যাটিন *migrare* থেকে Migration শব্দটির উৎপত্তি। যার ইংরেজি to travel, বাংলা ভ্রমণ এবং পারিভাষিক অর্থ **অভিপ্রয়াণ বা পরিযান**। তবে প্রাণিবিদ্যার ভাষায়, **অভিপ্রয়াণ বলতে লক্ষ্যহীনভাবে দিগ্বিদিক আসা-যাওয়া বা ভ্রমণ করা নয়, বরং খাদ্যগ্রহণ, প্রজনন, উপযুক্ত পরিবেশের সন্ধান এবং নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে খাদ্যগ্রহণস্থল** (feeding ground) **থেকে প্রজননস্থলে গমন এবং পরবর্তী সময়ে আবার ফিরে আসাকে অভিপ্রয়াণ বা পরিযান বা মাইগ্রেশন** (migration) **বলা হয়**। Nikolsky এর মতে, অভিপ্রয়াণ হলো প্রাচুর্যতার দিকে খাপ খাওয়ানোর একটি পদ্ধতি বা অভিযোজন (migration is an adaptation towards abundance)।

নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময় অন্তর পাখিরা যে গ্রীষ্মীয় বা শীতকালীন আবাসের মধ্যে যাতায়াত অথবা প্রজনন ও বাসা তৈরির স্থল থেকে আহার এবং বিশ্রামস্থলে যাতায়াত করে তাকে পাখির মাইগ্রেশন বা অভিপ্রয়াণ বলে। অর্থাৎ পৃথিবীর আবহাওয়াগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাখিরা পৃথিবীর এক ভৌগোলিক অঞ্চল ছেড়ে অন্য ভৌগোলিক অঞ্চলের অনুকূল পরিবেশে কিছু সময় অতিবাহিত করার পর পুনরায় পূর্বের স্থানে ফিরে আসার গমনাগমনকে পাখির অভিপ্রয়াণ (migration) বলে। এসব পাখি ট্রানসিয়েন্ট পরিযায়ী।

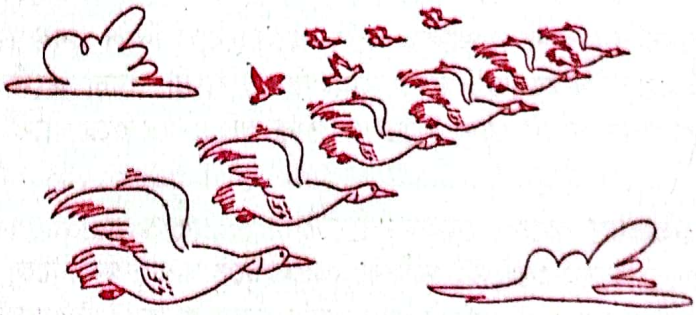

চিত্র ১২.১৬ : পাখির মাইগ্রেশন

আবহাওয়া ও ঋতুগত পরিবর্তন, তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি, দিন ও রাতের হ্রাস-বৃদ্ধি, খাদ্যের অভাব, প্রজননগত সমস্যা এবং অন্তঃপ্রজাতিক প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি সমস্যার কারণে নিরাপদ আশ্রয়স্থল, সুবিধাজনক খাদ্যগ্রহণস্থল, প্রজননস্থল, অন্তঃপ্রজাতিক প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়ানোর জন্য এবং সর্বোপরি উপযুক্ত পরিবেশের সন্ধানে পাখি অভিপ্রয়াণ বা আসা-যাওয়া করে। পাখির অভিপ্রয়াণ একটি সহজাত আচরণ এবং তা বিস্ময়কর হিসেবে আজও মানুষের মনে বিরাজমান।

অভিপ্রয়াণের কারণ (Causes of Migration)

পাখির অভিপ্রয়াণকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে বিভিন্ন পাখিবিশারদ এ প্রসঙ্গে কতকগুলো কারণ উপস্থাপন করেছেন। যেমন–

১। **পরিবেশীয় উদ্দীপক** (Environmental stimuli) : পাখিরা বিভিন্ন কারণে, যেমন– খাদ্যের স্বল্পতা, রাতের তুলনায় দিন ছোট, ঠাণ্ডার তীব্রতা, ঝড়ো আবহাওয়া ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন সুবিধাজনক আবাসস্থলের খোঁজে অভিপ্রয়াণ করে।

২। জননকোষ ও প্রজনন অঙ্গের উদ্দীপক (Gamete and Gonadial stimuli) : শীতের শেষভাগ ও প্রাক-বসন্তের লম্বা দিনে জননকোষ বর্ধন ও প্রজনন অঙ্গের পরিপক্বতা আসার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক পাখির শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন আসে, ফলে পাখি অভিপ্রয়াণে বাধ্য হয়।

৩। হরমোনাল নিঃসরণ (Hormonal secreation) : **থাইরক্সিন হরমোন** (thyroxin hormone), **গোনাডোট্রপিক হরমোন** ইত্যাদি পাখির শারীরিক ও আচরণে অনেক পরিবর্তন আনে যার ফলে পাখি অভিপ্রয়াণ করে।

৪। বিপাকীয় মতবাদ (Metabolic hypothesis) : পাখিরা তাদের দেহে বিপুল পরিমাণ **চর্বি** (fat) সঞ্চিত করে। উক্ত সঞ্চিত চর্বি পাখির বিপাকীয় কার্যকলাপে যে পরিবর্তন আনে তাই পাখিকে অভিপ্রয়াণে বাধ্য করে।

অভিপ্রয়াণের প্রকারভেদ (Types of Migration)

বিভিন্ন পাখিবিশারদের মতে বিভিন্ন কারণে শীতের পাখির অভিপ্রয়াণ বিভিন্ন প্রকারের হয়। যথা–

১। অক্ষাংশাভিমুখ বা উত্তর থেকে দক্ষিণে অভিপ্রয়াণ (Latitudinal migration) : উত্তর থেকে দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ থেকে উত্তরে এ ধরনের অভিপ্রয়াণ সংঘটিত হয়। অধিকাংশ পাখিই এই অভিপ্রয়াণ করে থাকে। এটি সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় উত্তর গোলার্ধে। উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়ার অনেক পাখিই শীতকালে বিষুবরেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চলে চলে আসে। যেমন– **গোল্ডেন প্লোভার** (*Pluvialis dominica*), **পেক্টোরাল স্যান্ডপাইপার** (*Calidris melanotos*) ইত্যাদি পাখির অভিপ্রয়াণ।

২। অনুদৈর্ঘ্য বা দ্রাঘিমা বরাবর অভিপ্রয়াণ (Longitudinal migration) : কিছু পাখি পরিবেশের প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা পেতে পূর্ব থেকে পশ্চিমে অথবা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অভিপ্রয়াণ করে। ক্যালিফোর্নিয়ার Gull এবং Duck এরূপ অভিপ্রয়াণ করে বা করতে অভ্যস্ত। এরা ছাড়াও **স্টার্লিং** পাখিরা তাদের পূর্ব-ইউরোপ বা এশিয়ার প্রজনন স্থান থেকে আটলান্টিক মহাসাগরীয় উপকূল বরাবর চলে আসে। এতে তারা মহাদেশীয় তীব্র শীতকাল এড়িয়ে চলতে পারে।

৩। উঁচু-নিচু অভিপ্রয়াণ (Altitudinal migration) : সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বিভিন্ন উচ্চতায় অবস্থিত পাহাড়ের চূড়া ও ভূমির মধ্যে পাখির যে গমনাগমন ঘটে তাকে উঁচু-নিচু বা উপর-নিচ অভিপ্রয়াণ বলে। অনেক শীতপ্রধান বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পাহাড়বেষ্টিত এলাকায় শীতকালের শুরুতে পর্বতশৃঙ্গের তাপমাত্রা যখন হ্রাস পায় তখন পাহাড়ে বসবাসকারী অনেক পাখি ক্রমশ নিচের দিকে অর্থাৎ সমভূমিতে নেমে আসে এবং গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে আবার পাহাড়ের উপরে চলে যায়। আর্জেন্টিনার Grebes, Coots, গ্রেট ব্রিটেনের Violet green swallows এবং সাইবেরিয়ার Willow ptarmigan পাখি, হিমালয়ের পাপিয়া পাখি এ ধরনের অভিপ্রয়াণ করে থাকে।

৪। আংশিক অভিপ্রয়াণ (Partial migration) : কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসরত পাখি প্রজাতির সঙ্গে একই প্রজাতির অন্য অঞ্চলের পাখি এসে যোগ দিলে সেই ভ্রমণকে আংশিক অভিপ্রয়াণ বলে। যেমন– নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের (কানাডা, উত্তর আমেরিকা) লক্ষ্মী প্যাঁচা ও নীলকণ্ঠ উষ্ণ অঞ্চলের (দক্ষিণ আমেরিকা) একই প্রজাতির পাখিদের সাথে যোগ দিতে আংশিক অভিপ্রয়াণ করে থাকে।

৫। ঋতুগত অভিপ্রয়াণ (Seasonal migration) : কিছু কিছু পাখি ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ ধরনের অভিপ্রয়াণ করে। যেমন– ব্রিটেনের Swift, Swallow, Nightingale, Cuckoo ইত্যাদি পাখি Summer visitor। বসন্তকালের শুরুতেই দক্ষিণ অঞ্চলে চলে যায়। অন্যদিকে, Fieldfare, Snow bunting, Redwing ইত্যাদি পাখিগুলো Winter visitor। পাখিগুলো শরৎকালের শুরুতেই উত্তর অঞ্চল থেকে এসে সারা শীতকাল বাইরে কাটায়, বসন্তকালে আবার উত্তরদিকে যাত্রা করে। প্রকৃতির এ অতিথিগুলো প্রাকৃতিক কারণেই বা বেঁচে থাকার তাগিদেই এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় আসে এবং নির্দিষ্ট সময় পর আবার ফিরে যায় নিজস্ব আবাসভূমিতে।

৬। ফাঁসাকার অভিপ্রয়াণ (Loop migration) : যখন পাখিরা প্রজনন স্থান এবং শীতকালীন স্থানের মধ্যে এমন দুটি পথে ভ্রমণ করে যে ভ্রমণপথটি একটি ফাঁসের আকার নেয় তখন ওই পরিভ্রমণকে ফাঁসাকার অভিপ্রয়াণ বলে। যেমন– গোল্ডেন প্লোভার পাখিদের প্রজনন স্থান হলো আলাস্কা থেকে কানাডা ও বাফিন দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত।

অভিপ্রয়াণের সুবিধা (Advantages of Migration)

(১) প্রতিকূল পরিবেশ থেকে নিজেদের ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের রক্ষা করতে অভিপ্রয়াণ সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করে। (২) খাদ্যের সংস্থানে সাহায্য করে। (৩) অভিপ্রয়াণের ফলে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি যখন দূরে কোনো নতুন পরিবেশে জড়ো হয় তখন তাদের মধ্যে **আন্তঃপ্রজননের** (inter breeding) ফলে জিন বিনিময়ের মাধ্যমে নতুন প্রকরণের উদ্ভব হয়। (৪) অভিপ্রয়াণ পাখির গোনাডের বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (৫) অভিপ্রয়াণ পাখির খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনে সাহায্য করে।

অভিপ্রয়াণের অসুবিধা (Disadvantages of Migration)

(১) লাখ লাখ পাখি প্রতিবছর অভিপ্রয়াণ করে, কিন্তু সব পাখিই তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারে না। কারণ পথে নানা প্রকার দুর্যোগের কবলে পড়ে অনেক পাখি মৃত্যুবরণ করে। (২) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও অনেক পাখি ঘাতকের হাতে মারা পড়ে। তাছাড়া খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের অভাবেও অনেক পাখি দুর্বল হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা সহজেই শিকারির শিকারে পরিণত হয়।

পাখির অভিপ্রয়াণের তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য (Significant features of Bird Migration)

(১) পাখি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পথে অভিপ্রয়াণ সম্পন্ন করে। অর্থাৎ বছরের পর বছর তারা একই সময়ে একই পথে আগমন করে এবং ঠিক একই সময় একই পথে তারা আবার ফিরে যায়। (২) অভিপ্রয়াণের সময় পাখির উড্ডয়ন গতিবেগ এবং দূরত্ব অতিক্রম করার ক্ষমতা একেক প্রজাতিতে একেক রকম। ছোট ডানাবিশিষ্ট পাখি স্বল্প দূরত্ব এবং বড় ডানাবিশিষ্ট পাখি অধিক দূরত্ব অতিক্রম করে থাকে। (৩) অভিপ্রয়াণের সময় পাখিরা দলবদ্ধভাবে চলাচল করে। (৪) দূরপাল্লার অভিপ্রয়াণের ক্ষেত্রে দেহে সঞ্চিত খাদ্য ও তৈল যথাক্রমে ক্ষুধা নিবারণ ও জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশের কয়েকটি শীতকালীন অভিপ্রায়ী বা পরিযায়ী পাখির তালিকা

বাংলাদেশের শীতকালে (নভেম্বর-জানুয়ারি) উত্তর গোলার্ধের দেশগুলো বিশেষ করে উত্তর ইউরোপ, সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া, নেপাল প্রভৃতি দেশ থেকে প্রচুর পাখি এসে এখানকার খাল-বিল, ঝিল, হাওর-বাঁওড়, নদ-নদীতে ঘুরে বেড়ায়। সুন্দরবন, দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন হাওর ও বিল, চলন বিল, বরিশালের দূর্গাসাগর হাওর, দিনাজপুরের রামসাগর, চট্টগ্রামের কাপ্তাই হ্রদ, সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার বিল, মৌলভীবাজারের হাকালুকি হাওর, রাজশাহীর বাঘার বিভিন্ন দীঘি ও নওটিকা বিল, শ্রীমঙ্গলের হাইল হাওড়ের বাইক্কা বিল, নোয়াখালীর নিঝুম দ্বীপ প্রভৃতি অভয়াশ্রমে হাজার হাজার অতিথি পাখি এসে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। মিরপুরের সিরামিক লেক, চিড়িয়াখানার লেক এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও এর আশপাশের জলাশয়গুলোতে অতিথি পাখিদের ঝাঁক বেঁধে বিচরণের দৃশ্য ও কলকাকলিতে আমরা দারুণভাবে মুগ্ধ হই। অথচ এই অতিথি পাখিগুলোর সঙ্গে আমরা কতই না নিষ্ঠুর আচরণ করি। কখনো ফাঁদ পেতে, আবার কখনো বা বিষটোপ দিয়ে এদের মারার চেষ্টা করি। অথচ বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষায় এদের গুরুত্ব অপরিসীম।

অধ্যাপক কাজী জাকের হোসেনের মত অনুযায়ী, বাংলাদেশে মোট ৫২৫-৫৫০টি পাখি প্রজাতি আছে। বাংলাদেশের প্রায় ৫০০টি প্রজাতির স্থায়ী পাখি রয়েছে, অস্থায়ী বা বিদেশি পাখি প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৩০০। বাংলাদেশে প্রাপ্ত কয়েকটি শীতকালীন পরিযায়ী পাখির নাম দেওয়া হলো–

বৈজ্ঞানিক নাম	লোকাল বা স্থানীয় নাম	ইংরেজি নাম
Ciconia ciconia	সাদা মানিকজোড়	Swinhoe Eastern white Stork
Anser indicus	বার মাথা রাজহাঁস/ বুনো রাজহাঁস	Barheaded Goose
Tadorna ferruginea	চখাচখি	Rudy sheld duck/Brahminy Duck
Anas acuta	লেঞ্জা বা সুচলেজা/বড় ডিগর/শোলন কো	Pin tail
Anas penelope	ছোট লালশির	Wigeon
Aythya fuligula	বামন হাঁস/বামুনিয়া হাঁস	Tufted Duck
Accipiter nisus	চড়ুই হক	Asiatic sparrow Hawk
Porzana porzana	চিত্রা ক্রেক/গুরগুরি/খাইরি	Spotted Crake
Monticola solitarius	নীল পাথুরে থ্রাস	Blue Rock Thrush
Motacilla citreola	হলুদ মাথা খঞ্জনা	Northern yellow headed wagtail
Carpodacus erythrinus	সাধারণ গোলাপি ফিঞ্চ	Common rosefinch
Lanius cristatus	বাদামি কসাই পাখি	Brown shrike

বালুবাটান বা চা-পাখি
(*Tringa stagnatilis*)

লেঞ্জা হাঁস
(*Anas acuta*)

আমেরিকান গোল্ডেন প্লোভার
(*Pliuvialis dominica*)

কাদা খোঁচা
(*Gallinago gallinago*)

সাদা বক
(*Ciconia ciconia*)

চিত্র ১২.১৭ : কতিপয় অভিপ্রয়াণি পাখি

❑ **কাজ :** (i) পাখিদের পরিযানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। (ii) শীতকালীন পাখিগুলোর আমাদের দেশে আসার কারণ ব্যাখ্যা কর।/পাখিদের পরিযানের কারণ ব্যাখ্যা কর। (iii) অতিথি পাখি সংরক্ষণে করণীয় সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

(খ) মাকড়সার জাল (Spider Web)

মাকড়সা Arthropoda পর্বের Arachnida শ্রেণির অমেরুদণ্ডী প্রাণী। অনেক প্রজাতির মাকড়সা পোকামাকড় জাতীয় খাদ্য শিকারের জন্য জাল বুনে (spinning web) ফাঁদ পাতে। জাল বোনা মাকড়সার একটি সম্পূর্ণ সহজাত (instinctive) প্রক্রিয়া। মাকড়সার জাল বুনতে আধঘণ্টারও কম সময় লাগে। মাঠে যেসব মাকড়সা বাস করে তাদের অধিকাংশ ভোরে সূর্যোদয়ের সময় জাল বোনে। মাকড়সার স্বল্প দৈর্ঘ্যের জীবনে কখনোই এই জটিল বুনন শেখার সময় হয়ে ওঠে না। জাল তৈরি হচ্ছে স্বভাবগত বা স্বভাবসিদ্ধ আচরণের (innate behaviour) উদাহরণ, যাকে **নির্ধারিত ক্রিয়াধারা** (Fixed Action Pattern, FAP) বলে। একবার আরম্ভ হওয়া নির্ধারিত ক্রিয়াধারা বাধাগ্রস্ত করা সম্ভব নয়। নির্ধারিত এ ক্রিয়াধারা হচ্ছে এমন সহজাত প্রতিক্রিয়া, যা পরিবেশ কর্তৃক প্রভাবিত হয় না, এমনকি পরিবর্তনও করা যায় না।

চিত্র ১২.১৮ : মাকড়সার জাল বুনন

উদাহরণস্বরূপ, একটি মাকড়সার অবস্থান নির্বিশেষে একই ধরনের জাল বুনতে পারে। জাল বুনার এ ক্রিয়াধারা কোনো অর্জিত আচরণ নয়; বরং বংশগতভাবে অনুক্রমকৃত আচরণ, অর্থাৎ সহজাত আচরণ। মাকড়সা ডিম পাড়ার প্রস্তুতিলগ্নে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে **সিল্ক কোকুন** (silk cocoon) বুনে। যা বাইরের কোনো প্রভাবকের বিবেচনা ছাড়াই সবসময় একই ভাবে ঘটে থাকে। স্ত্রী মাকড়সা একটি ভিত্তিতল (base plate) গঠনের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াটি শুরু করে। এই তলে ডিম পাড়ার পর কোকুনের ভিত্তিতলের চারদিকে দেয়াল নির্মাণ করে এবং ঢাকনা সৃষ্টির মাধ্যমে এটিকে বন্ধ করে দেয়। মাকড়সার বৃত্তের জাল বুনে রেশমি সুতা দিয়ে। মাকড়সার উদরের নিচে অবস্থিত **স্পিনারেট** (spinnerets) নামক সিল্ক গ্রন্থি (silk gland) থেকে নিঃসৃত ফাইব্রোইন (fibroin) নামক **স্ক্লেরোপ্রোটিন** (scleroprotein) থেকে সৃষ্ট সুতা বাতাসের সংস্পর্শে এসে শক্ত রেশমি সুতায় পরিণত হয়। এ সুতা একই ব্যাসের ইস্পাতের সুতা অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী। এ সুতা নাইলনের চেয়ে দ্বিগুণ স্থিতিস্থাপক এবং এটি টান দিয়ে ছিঁড়তে গেলে এক-পঞ্চমাংশ পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এদের জালে সহজেই কীট পতঙ্গ আটকে যায় কারণ জালে এগ্লিগেট (agligate) ও ফ্লেজেলিফর্ম (flageliform) জাতীয় আঠালো পদার্থ থাকে। এছাড়াও জালে টিউবিকুলিফর্ম (tubiculiform) পদার্থ রয়েছে যা ডিমকে আটকে রাখতে সহায়তা করে।

সর্বপ্রথম **Hans Peters** (1939) মাকড়সার জাল বুননের ধাপ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। প্রজাতিভেদে মাকড়সার জালের বিভিন্নতা দেখা যায়। এমনকি একই প্রজাতিভুক্ত মাকড়সা ভিন্নরকম জাল বুনে থাকে। এদের জাল গোলাকৃতির (orb web) চোঙাকৃতির (funnel web), পাতাকৃতির (sheet web) এবং বলয়াকৃতির (dome web) হতে পারে। জালিকা বৃত্ত একটি নিয়ত গঠন, এটি **কাঠামো** (frame), **অরীয় স্পোক** (radial spokes) এবং **আঠাল পেঁচ** (viscid spirals) নিয়ে গঠিত।

জাল বুননের এই আচরণগত পদ্ধতি এতই দৃঢ় যে, যদি স্বয়ং মাকড়সাও চায় তবুও এই বুনন পদ্ধতিকে নবরূপ দিতে বা পরিবর্তন করতে পারে না। ভিত্তিতল গঠনের পর স্ত্রী মাকড়সাটিকে যদি সশরীরে সরিয়ে নেওয়া হয় তবুও সে ডিম পাড়বে, দেয়াল ও ঢাকনা নির্মাণের প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রেখে এবং সে জানবেও না যে, ভিত্তিতলটি সেখানে অনুপস্থিত। যার ফলে ডিমগুলো পড়ে যাবে তার অসম্পূর্ণ কোকুনের গড়ন থেকে। স্ত্রী মাকড়সাকে যদি তার পূর্বে নির্মিত ভিত্তিতলে পুনরায় কোকুন তৈরির জন্য ফিরিয়ে আনা হয় তবে সে পূর্বের মতো ভিত্তিতলকে কোকুন তৈরিতে ব্যবহার না করে রোবটের মতো পুনরায় প্রথম থেকে নতুন করে ভিত্তিতল তৈরি করা শুরু করবে। যেন সেখানে আগে কোনো ভিত্তিতলই ছিল না।

(গ) অপত্যের প্রতি যত্ন (Parental Care)

সাধারণ অর্থে ডিম ও সন্তান লালন-পালন এবং রক্ষণাবেক্ষণকে **অপত্যের প্রতি যত্ন** বা **পিতৃ-মাতৃ যত্ন** (parental care) বলা হয়। শিশুসন্তানের প্রতি যত্নবান হওয়া বা ডিম পাড়ার পর ডিমে তা দেওয়া ও যত্ন নেওয়া প্রাণীদের এক সহজাত আচরণ। স্তন্যপায়ী প্রাণীতে এ আচরণ অত্যন্ত উন্নত হলেও সামাজিক পতঙ্গ, মাছ, উভচর, সরীসৃপ ও পাখিতে অপত্য লালন স্বভাব কম-বেশি লক্ষণীয়। প্রতিকূল পরিবেশ ও শত্রুর হাত হতে রক্ষার জন্য পিতা-মাতা কর্তৃক ডিম ও শিশুসন্তানের লালন-পালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ স্বভাব প্রাণীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হয়েছে। জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য অপত্যের প্রতি যত্ন অভিযোজনস্বরূপ।

পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা, শত্রুর হাত হতে রক্ষা এবং বংশের ধারা অটুট রাখার নিমিত্তে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর পিতামাতা তাদের অপত্য দশার প্রতি যত্নবান হওয়ার সহজাত আচরণকে বা যত্ন নেওয়ার কৌশল বা পদ্ধতিকে অপত্যের প্রতি যত্ন বা পিতৃ-মাতৃ যত্ন বা অপত্য পালন বা বাৎসল্য আচরণজনিত পালন (parental care) বলে। অপত্য পালনের মাত্রা অপত্যের সংখ্যার ব্যস্তানুপাতিক।

১। মাছের অপত্যের প্রতি যত্ন (Parental Care of Fishes)

অধিকাংশ মাছ তাদের অপত্যের (ডিম ও পোনা) প্রতি যত্নবান নয়। দেখা গেছে, যেসব মাছ পানিতে অধিক সংখ্যক ডিম পাড়ে তাদের মধ্যে অপত্যের প্রতি যত্ন বা অপত্য পালন বা বাৎসল্য আচরণ খুবই নগণ্য। এরা ডিম ছাড়ার পর প্রজননক্ষেত্র থেকে অন্যত্র চলে যায়। তবে যারা কম সংখ্যক ডিম পাড়ে তাদের মধ্যে অপত্যের প্রতি যত্ন বা বাৎসল্য আচরণ বেশি। মাছ নানাভাবে ডিম ও পোনার পরিচর্যা এবং প্রতিপালন করে থাকে। এক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রী অথবা উভয়ই অনন্য ভূমিকা পালন করে। নিচে এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

(ক) ডিম পাড়ার স্থান নির্বাচন (Selection of spawning ground) : ডিম পাড়ার জন্য কিছু কিছু মাছ উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে। অনেক Anadromous মাছ (যেমন– *Tenualosa, Petromyzon,* Salmon ইত্যাদি) ডিম পাড়ার পূর্বে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি থেকে নদীর স্বাদু পানিতে চলে আসে। অদ্রূপ কিছু Catadromous মাছ (যেমন– স্বাদু পানির Eel) ডিম পাড়ার সময় নদী থেকে সমুদ্রে গমন করে। উড়ুক্কু মাছের (Flying fish) ক্ষেত্রে শক্ত অবধারকের সাথে ডিমগুলো আটকানো থাকে। তবে পাইক (*Esox lucius*), কার্প (*Cyprinus carpio*) ইত্যাদি জলজ উদ্ভিদের ওপর ডিম ছড়িয়ে দেয়। এতে ডিমগুলো উদ্ভিদের পাতায়, শাখায় আটকে যায়। ফলে তলার খাদক ডিম খেতে পারে না।

(খ) বাসা নির্মাণ (Nest formation) : অসংখ্য মাছ ডিম পাড়ার পূর্বে বাসা তৈরি করে এবং বাসায় অপত্য লালনের চেষ্টা চালায়। এদের কেউ বাসা তৈরি করে মাটিতে গর্ত করে, কেউ বা নুড়িপাথর দিয়ে, আবার কেউ বা আগাছা বা জৈব আবর্জনা দিয়ে। [বাসা প্রস্তুতকারী কতক মাছের নাম– *Apeltes quadracus, Belontia signata, Betta bellica, Betta splendens, Colisa fasciata, Colica lalia, Colisa labiosa, Eucalia inconstans, Trichopsis vittata, Pungitius pungitius.*] বাসা নির্মাণকারী মাছের মধ্যে, এক ধরনের মাছ বাসা নির্মাণ করে এবং ডিম পাড়ার পর বাসা পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ এরা বাসা পাহারা দেয় না। যেমন– *Petromyzon, Oncorhynchus* ইত্যাদি। আবার অন্য ধরনের মাছ বাসা তৈরি করে ডিম ফুটে বাচ্চা পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত বাসা পরিত্যাগ করে না। যেমন– Sun fish (*Lepomis*), Bow fin (*Amia*), লাংফিস (*Protopterus, Lepidosiren*) ইত্যাদি।

কিছু কিছু মাছের (যেমন– Carp, Goldfish) ডিম জলজ উদ্ভিদের মাঝে ছড়ানো থাকে। আবার কতক মাছ (যেমন– Trout, White fish) তাদের ডিমগুলো ছোট ছোট নুড়িপাথর বা বালুকণায় ছড়িয়ে রাখে। আবার কতক মাছ (যেমন– Yellow perch) পাকানো রজ্জুর মতো গুচ্ছে ডিম পাড়ে।

(গ) ডিম ও পোনা রক্ষণাবেক্ষণ : ডিম ও পোনা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাছ বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে। নিচে মাছের ডিম ও পোনা সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

১। মুখগহ্বরে ও অন্ত্রে ডিম ও পোনা সংরক্ষণ (Shelter of egg and spawn in mouth cavity and intestine) : অনেক মাছের মুখগহ্বরের মধ্যে নিষিক্ত ডিম্বাণুর পরিস্ফুটন ঘটে। Cichlids-এর স্ত্রী সদস্য মুখের মধ্যে ডিম বহন করে। এমনকি এদের পোনা বিপদের সময় মাছের মুখগহ্বরে আশ্রয় নেয়। *Tilapia* মাছের মুখগহ্বরের মধ্যে ডিম ও পোনা আশ্রয় নেয়। ক্যাটফিশ মাছের (*Arius*) পুরুষ সদস্যের মুখগহ্বরে ডিম ও পোনা নিরাপদে সংরক্ষিত থাকে। কিছু মাছ (*Tachysurus*) নিষিক্ত ডিমগুলোকে রেণুপোনায় স্ফুটনের পূর্ব পর্যন্ত অন্ত্রে ধারণ করে রাখে।

২। ব্রুডথলি গঠন (Brood pouch formation) : সাগর ঘোড়া (*Hippocampus*) ও পাইপ ফিসের (*Syngnathus*) স্ত্রী সদস্য পুরুষের ব্রুডথলিতে (brood pouch) ডিম পাড়ে এবং এই থলির মধ্যে ডিমগুলোর পরিস্ফুটন ঘটে।

৩। ডিমকে ঘিরে পেঁচিয়ে থাকা (Coiling round the eggs) : বাটার ফিশের (*Pholis gunnellus*) স্ত্রী সদস্যরা গোলাকার গুচ্ছে ডিম পাড়ে এবং ডিমগুলো গোলাকার বলের ন্যায় দেখায়। এ সময় পুরুষ বা স্ত্রী (সম্ভবত পুরুষ) ডিমের চারপাশে পেঁচিয়ে থেকে ডিমগুলো পাহারা দেয় ও লালন-পালন করে।

বৃত্তাকার বাসা পুরুষ bowfin
(ক) ডিম ও সদ্য ফোটা পোনার পাহারায় Bowfin

স্ত্রী তেলাপিয়া মাছ সদ্য ফোটা পোনা
(খ) স্ত্রী তেলাপিয়া মাছ মুখ গহ্বরে রেখে পোনাকে রক্ষা করে

(গ) পুরুষ সামুদ্রিক ঘোড়ার ব্রুডথলি

(ঘ) ডিম পেঁচিয়ে পাহারারত অবস্থায় বাটার ফিশ

(ঙ) উদরের ত্বকীয় বাটিতে *Platystacus*-এর অপত্য ধারণ

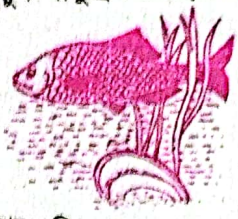

(চ) স্ত্রী বিটারলিং (*Rhodeus amarus*) তার ওভিপজিটর দিয়ে ঝিনুক খোলকের ভেতর ডিম স্খলন ও মজুদকরণ

(ছ) নিউগিনি মাছের (*Kurtus*) পৃষ্ঠপাখনা আংটার ন্যায় অংশে ডিমের গুচ্ছ

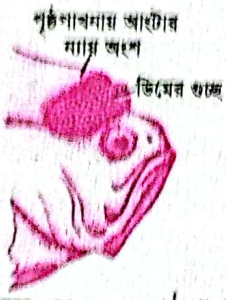

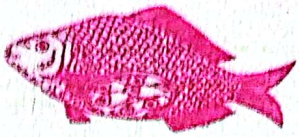

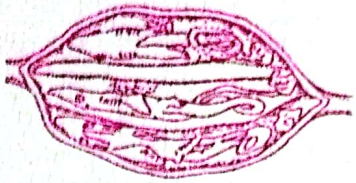

১. *Cymatogaster aggreata*-এর উদরে ডিমের পরিস্ফুটন;
২. হাঙরের (*Mystellus* sp.) কুসুম থলি অমরা
(জ) উদরে ডিম পরিস্ফুটন ও ইয়োকথলি অমরা গঠন :

চিত্র : ১২.১৯ : মাছের অপত্যের প্রতি যত্ন

৪। ত্বকে পেয়ালার ন্যায় গর্ত সৃষ্টি (Formation of cup in integument) : কিছু ক্যাটফিশ (যেমন– *Platystacus*, *Aspredo*) উন্নত ধরনের পন্থায় ডিম পরিবহন করে। প্রজনন ঋতুতে স্ত্রীদের পেট অঞ্চলের ত্বক নরম ও স্পঞ্জি হয়। নিষেকের পর মাছ তার নরম ত্বকের ওপর ডিমগুলো চাপ দিলে, ত্বকে ডিমগুলো পেয়ালার মতো গর্তে ঢুকে যায় এবং না ফোটা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে।

৫। ঝিনুকের ম্যান্টল গহ্বরে ডিম সংরক্ষণ (Shelter of egg in mantle cavity of mussel) : স্বাদু পানির ঝিনুকের ম্যান্টল গহ্বরে Cyprinidae গোত্রভুক্ত ইউরোপীয় বিটারলিং মাছ (*Rhodeus amarus*) ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার পর স্ত্রী মাছের ডিম্বনালি লম্বা হয়ে একটি দীর্ঘ নালি (siphon) গঠন করে, যাকে Ovipositor বলা হয়। পরবর্তীকালে এই নালি ঝিনুকের ম্যান্টল গহ্বরে প্রবেশ করে।

৬। ডিম আবরকে ডিম সংরক্ষণ (Shelter of egg in egg capsules) : অনেক ডিম্বজ (oviporous) তরুণাস্থি মাছ (যেমন– *Scyllium*, *Raja*) নিষিক্ত ডিমকে কেরাটিন নির্মিত শৃঙ্গায়িত ডিম্ব আবরকে আবৃত রাখে। এই আবরকের আকর্ষণ ক্ষমতা থাকায় তা জলজ আগাছায় আটকে থাকে। পরিস্ফুটন শেষে আবরক ফেটে পোনা বেরিয়ে আসে।

৭। দেহের উপর সংবেষ্ঠন (Attachment to the body) : পুরুষ নিউগিনি মাছের (*Kurtus*) পৃষ্ঠ পাখনা বিশেষভাবে পরিবর্তন হয়ে আংটার ন্যায় গঠন তৈরি করে যাতে স্ত্রীরা গুচ্ছাকারে ডিম স্থাপন করে থাকে। ডিম থেকে রেণুপোনা ফুটে বের না হওয়া পর্যন্ত ওই আংটাতে আটকে থাকে।

৮। জরায়ুজ পরিস্ফুটন (Viviparity) : Viviparous মাছের মধ্যে অপত্য লালনের চরম উৎকর্ষতা লক্ষণীয়। জরায়ুজ পরিস্ফুটনে স্ত্রী মাছের ডিম্বনালিতে ডিম ফুটে পোনা বের হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে (যথা– *Mustellus*) কুসুম থলি (yolk sac), অমরা (placenta) গঠনের মাধ্যমে পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করে।

তিন কাঁটা স্টিকলব্যাক মাছের অপত্য লালন : **নিকো টিনবারজেন** (Niko Tinbergen, 1953) তিন কাঁটা স্টিকলব্যাক (Three spined Stickleback-*Gasterosteus aculeatus*) মাছে চমকপ্রদ অপত্য লালনের তথ্য প্রদান করেন। এসব মাছ উত্তর গোলার্ধের উপকূলীয় এলাকায় পাওয়া যায়। এদের পুরুষ মাছ ডিম পাড়ার জন্য প্রজনন এলাকা নির্ধারণ করে এবং অগভীর পানিতে বাসা নির্মাণ করে। এরা **জিগ-জ্যাগ নৃত্য** (zig-zag dance) প্রদর্শনের মাধ্যমে যৌন পরিপক্ব স্ত্রী মাছকে বাসায় নিয়ে আসে। পুরুষের প্ররোচনায় স্ত্রীটি বাসায় ডিম পাড়ে। ডিমগুলোর উপর পুরুষ মাছটি শুক্র ত্যাগ করে নিষেক ঘটায়। নিষেকের পর পুরুষটি স্ত্রীকে বাসা থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং আরও দু-তিনটি স্ত্রীকে একইভাবে বাসায় এনে ডিম পাড়ায়। ডিম ও বাচ্চাদের যত্ন নেওয়ার সকল দায়িত্ব পুরুষটি গ্রহণ করে। এরা নিষিক্ত ডিমগুলোকে বাসার নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে রাখে। এ সময় স্বজাতীয় স্ত্রী, পুরুষ, অন্য মাছ কিংবা খাদক ইত্যাদি যেকোনো ধরনের আগন্তুককে বাসার নিকট ভিড়তে দেয় না। এ সময় এরা বক্ষ পাখনা দ্বারা বাসার মধ্যে পানির স্রোত সৃষ্টি করে যাতে ডিমগুলো পরিস্ফুটনের জন্য পরিমিত অক্সিজেন পায়। এ পদ্ধতিকে **ফ্যানিং** (fanning) বলে। ডিম ফুটতে ৭-৮ দিন সময় লাগে। পোনাগুলো ঝাঁক বেঁধে চলা শিখতে না পারা পর্যন্ত এরা বাসা পাহারা দেয়। কখনো কোনো পোনা দলছুট হলে পুরুষটি ছুটে ঘিয়ে পোনাকে মুখে পুরে এনে নিজ দলের মধ্যে ছেড়ে দেয়। প্রায় ১৫ দিনের মধ্যে পোনাগুলো ঝাঁক বেঁধে চলার স্বভাব রপ্ত করে ফেললে পুরুষটি বাসা ত্যাগ করে পূর্ণবয়স্ক সাথীদের সাথে চলে যায়।

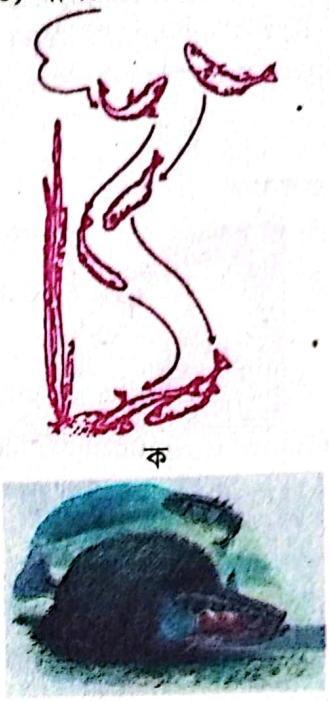

ক

খ

চিত্র ১২.২০ : তিন কাঁটা স্টিকলব্যাক মাছের জিগ-জ্যাগ নৃত্য ও প্রজনন আচরণ (ক ও খ)

২। ব্যাঙের অপত্যের প্রতি যত্ন (Parental Care of Frogs or Toads)

জলজ জীবন থেকে স্থলজ জীবনে প্রবেশ করায় উভচর (ব্যাঙ) প্রাণীরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাছাড়া অনেক অন্তঃ ও আন্তঃপ্রজাতিক শত্রু এদের ডিম, লার্ভা বা অপরিণত অবস্থা ভক্ষণ করে থাকে। এসব প্রতিকূলতা ও পরিবেশগত সমস্যা সমাধানকল্পে উভচররা (ব্যাঙ) বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে অপত্যের প্রতি যত্নের মাধ্যমে তাদের বংশের ধারা অক্ষুণ্ন রাখে। নিচে ব্যাঙের অপত্যের প্রতি যত্নের বিভিন্ন কৌশল সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

(ক) ডিম পাড়ার স্থান নির্বাচন (Selection of egg laying site) : কতক ব্যাঙ ডিম পাড়ার স্থান নির্বাচনের মাধ্যমে অপত্যের প্রতি যত্নের জন্য সচেষ্ট হয়। যেমন– প্রজননের পূর্বেই *Rhacophorus schlegeli* নদী বা পুকুরের কর্দমাক্ত কিনারায় গর্ত খনন করে। মিলনের সময় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে উক্ত গর্তে প্রবেশপূর্বক গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয়। প্রথমে স্ত্রী ব্যাঙ তার ক্লোয়েকা (cloaca) নিঃসৃত রস দিয়ে ফেনা তুলে তাতে ডিম পাড়ে এবং পুরুষ ব্যাঙ ওই ডিমগুলোর উপর শুক্রাণু ত্যাগ করে। সৃষ্ট ফেনা ডিমকে শুষ্কতা থেকে রক্ষা করে। এরপর স্ত্রী ও পুরুষ ব্যাঙ উভয়ই গর্তের তলায় সুড়ঙ্গ কেটে নদী বা পুকুরের পানিতে চলে যায়। ডিম থেকে লার্ভা সৃষ্টি হলে ফেনা তরলে পরিণত হয় এবং লার্ভা গড়িয়ে পানিতে চলে আসে।

(খ) বাসা তৈরি (Nest building) : অনেক ব্যাঙ তাদের অপত্যের যত্নের জন্য অর্থাৎ ডিম ও বাচ্চাদের প্রতিপালন করার জন্য বাসা তৈরি করে থাকে। এই বাসা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন–

(i) **কর্দমাক্ত বাসা** (Mud nest) : কতক প্রজাতির স্ত্রী ব্যাঙ (*Hyla faber*) প্রজননের পূর্বে কর্দমাক্ত জলাশয়ের কিনারে ছোট বাসা তৈরি করে এবং তাতে ডিম পাড়ে। পুরুষ ব্যাঙ এ ধরনের বাসা তৈরি করে।

(ii) **পাতার বাসা** (Leaf nest) : দক্ষিণ আমেরিকার গেছো ব্যাঙ (*Phyllomedusa*) তার ক্লোয়েকা নিঃসৃত আঠালো রস ব্যবহার করে পাতার কিনারাগুলো জোড়া লাগিয়ে বাসা তৈরি করে এবং তাতে ডিম পাড়ে। সাধারণত এ ধরনের বাসা জলাশয়ের সন্নিকটের উদ্ভিদের ঝুলন্ত শাখায় দেখা যায়। বৃষ্টির পানিতে বাসা ভরে গেলে ডিম থেকে লার্ভা বের হয়ে পানির উপর পড়ে।

(iii) **মোমের বাসা** (Wax nest) : কতক প্রজাতির গেছো ব্যাঙ (*Hyla resinifictrix*) মৌচাক থেকে মোম সংগ্রহ করে গাছের গুঁড়ির উপর বাটির ন্যায় বাসা তৈরি করে এবং বৃষ্টির পানি বাসায় জমে পূর্ণ হলে তাতে ডিম পাড়ে।

(iv) **বিটপের বাসা** (Shoot nest) : কিছু গেছো ব্যাঙ (*Triton*) গাছের কচি ডগা একত্রে জোড়া দিয়ে বাসা তৈরি করে এবং স্ত্রী ব্যাঙ ওই বাসায় ডিম পাড়ে।

(গ) পানিতে সৃষ্ট ফেনার মাধ্যমে অপত্যের প্রতি যত্ন (Formation of foam in water for parental care) : কিছু প্রজাতির ব্যাঙ (*Rhacophorus maculatus*) ডিম পাড়ার পরপরই, পানিতে স্ত্রী ও পুরুষ ব্যাঙ উভয়ই তাদের পেছনের পা আন্দোলনের মাধ্যমে ফেনা সৃষ্টি করে। সৃষ্ট ফেনা ডিমগুলোকে শুষ্কতা থেকে রক্ষা করে এবং শিকারি প্রাণীর দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়।

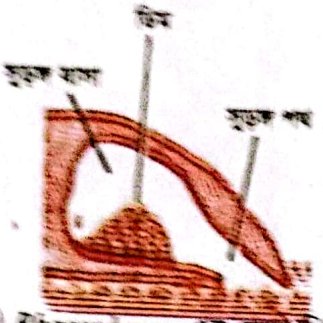

(ক) *Rhacophorus*-এর ফেনা নির্মিত বাসা

(খ) *Hyla faber*-এর কর্দমাক্ত/মেটে বাসা

(গ) পানির উপরে ঝুলন্ত ব্যাঙের (*Phyllomedusa*) পাতার তৈরি বাসা

(ঘ) *Rhacophorus maculatus* ফেনা নির্মিত বাসা

(ঙ) *Hyla goeldii*-এর পিঠে ডিম বা ব্যাঙাচি

(চ) *Alytes obstetricans*-এর পেছনের পায়ের সাথে ডিম

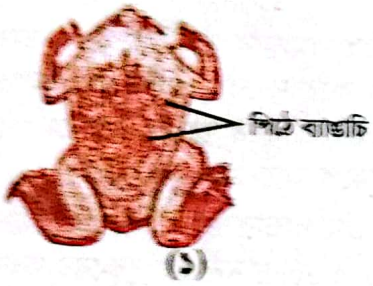

(ছ) *Pipa* spp. এর পিঠে ডিম পরিবহন ও পরিস্ফুটন

(জ) পুরুষ *Phyllobates* এর পিঠে ব্যাঙাচি

চিত্র ১২.২১ : ব্যাঙের অপত্যের প্রতি যত্ন

(ঘ) দেহে ডিম পরিবহন (Carrying eggs on body) : বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাঙ তাদের অপত্যের যত্নের জন্য বিভিন্নভাবে তাদের ডিম দেহে পরিবহন করে। যেমন–

(i) **পিঠে অপত্য থলি** (Brood pouch in back) : অনেক স্ত্রী ব্যাঙের (*Hyla goeldii*) পিঠের ত্বক ভাঁজ হয়ে অপত্য থলি (brood pouch) গঠিত হয় এবং সেখানে ডিম সংস্থাপিত হয়। ডিমগুলো লার্ভায় রূপান্তর হওয়ার আগ পর্যন্ত এই থলিতে অবস্থান করে।

(ii) **উরু অঞ্চলে ডিমের রজ্জু** (Egg string on thigh) : কিছু প্রজাতির পুরুষ ব্যাঙ (*Alytes obstetricans*) স্ত্রী কর্তৃক নির্গত ডিমের রজ্জু পশ্চাৎপদের উরু অঞ্চলে জড়িয়ে রাখে এবং ব্যাঙাচি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ডিম প্রতিপালন করে থাকে।

(iii) **পিঠের গর্তে ডিম পরিস্ফুটন** (Development of eggs in dorsal pits) : প্রজনন ঋতুতে *Pipa* গণের অনেক প্রজাতির (যেমন– *Pipa americana* ও *Pipa dorsigera*) স্ত্রী ব্যাঙেরা পিঠে আলাদা আলাদা গর্তে নিষিক্ত ডিম বহন করে এবং নিষিক্ত ডিম্বাণুর পরিস্ফুটন ওই গর্তেই সম্পন্ন হয়। এই গর্তেই অপ্রকৃত অমরার মাধ্যমে ভ্রূণের সঙ্গে মাতৃদেহের সংযোগ সাধিত হয়।

(ঙ) দেহে ব্যাঙাচি বহন (Carrying tadpole on back) : কিছু প্রজাতির পুরুষ ব্যাঙ (*Phyllobates*) তাদের ব্যাঙাচিগুলো পিঠে বহন করে এক জলাশয় থেকে অন্য জলাশয়ে গমন করে।

(গ) অণ্ড-জরায়ুজ পরিস্ফুটন (Ovo-viviparity) : কতক প্রজাতির আফ্রিকান স্ত্রী ব্যাঙ (যেমন– *Pseudophryne, Nectophrynoidese* ইত্যাদি) ডিমের পরিবর্তে বাচ্চা প্রসব করে। প্রকৃতপক্ষে এদের ডিম্বনালিতে নিষিক্ত ডিমগুলোর পরিস্ফুটন ঘটে। এক্ষেত্রে লার্ভার লম্বা রক্তনালি সমৃদ্ধ লেজ মাতৃদেহের সাথে অমরার ন্যায় সংযোগ স্থাপন করে পুষ্টি জোগায়।

৩। পাখির অপত্যের প্রতি যত্ন (Parental Care of Birds)

পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি রয়েছে। আর তাদের অপত্য যত্নে রয়েছে বৈচিত্র্যতা। তবে অপত্য লালনে বৈচিত্র্যতা দেখা গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। **কোকিল ও কাউবার্ড** ব্যতীত সকল পাখিতে অপত্যের প্রতি যত্ন পরিলক্ষিত হয়। নিচে সংক্ষেপে পাখির অপত্যের প্রতি যত্ন আলোচনা করা হলো–

সাধারণত পাখির অপত্য যত্ন বলতে তাদের বাসা তৈরি থেকে বাচ্চা বা শাবক স্বাধীনভাবে চলাচলের পূর্ব পর্যন্ত পিতা-মাতার সান্নিধ্যে থাকাকেই বোঝায়। তবে আসল অপত্য যত্ন শুরু হয় বাচ্চা ফুটে বের হওয়ার পর থেকেই। **বাচ্চাদের ব্রুডিং** (brooding), **নেসলিংদের খাওয়ানো** (feeding nestling) এবং শিকারিদের (predators) থেকে শাবকদের রক্ষা করার মাধ্যমেই পাখিরা অপত্যদের যত্ন করে থাকে।

১। বাসা তৈরি (Nest building) : বিভিন্ন প্রজাতির পাখি সাধারণত ডিম পাড়ার জন্য ও বাচ্চা লালন পালন করার জন্য বাসা তৈরি করে। কিছু পাখি খোলামেলা জায়গায় বাসা তৈরি ছাড়াই ডিম পেড়ে থাকে। আবার কিছু প্রজাতির পাখি (যেমন– কোয়েল, হামিংবার্ড, আবাবিল ইত্যাদি) মাটিতে, কিছু মানুষের তৈরি বাসায় (মুরগি, কবুতর ইত্যাদি), কিছু গাছের কাণ্ডের মধ্যে গর্ত করে (যেমন- কাঠঠোকরা, ব্লুবার্ড ইত্যাদি) এবং কিছু গাছের শাখায় অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানে বাসা বাঁধে (যেমন-বাবুই পাখি)। শিকারি পাখিরা অনেক উঁচুতে বাসা তৈরি করে থাকে যাতে তারা বিভিন্ন প্রতিকূলতা (যেমন– প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শিকারি প্রাণী ইত্যাদি) থেকে রক্ষা পায়। মাছরাঙা পাখি নদীর পাড় খুড়ে টানেল আকৃতির বাসা তৈরি করে। আবার অনেক পাখি যেমন ইউরোপিয়ান কোকিল নিজেরা কোনো বাসা তৈরি না করে বরং অন্যের বাসায় (যেমন-কাকের বাসায়) ডিম পেড়ে থাকে। বাসা তৈরির জন্য পাখিরা সাধারণত স্থানীয় গাছের ডালপালা, নিজের গালক, লালা, বিষ্ঠা, মাকড়সার জাল, কাদামাটি ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। অনেক সময় পাখিরা ভীমরুল, মৌমাছি, প্রভৃতি বিষাক্ত পতঙ্গের চাকের পাশে বাসা তৈরি করে শত্রু মোকাবেলা করার জন্য তাদের কাজে লাগায়। অনেক সময় বড় পাখিদের বাসার পাশে ছোট পাখিদের বাসা তৈরি করতে দেখা যায়। ছোট পাখি ও তাদের ছানা বড় পাখিদের নিকট থেকে বাড়তি নিরাপত্তা পেয়ে থাকে। পুরুষ সদস্যরা বাসা তৈরি শুরু করার মধ্যে দিয়ে স্ত্রী সদস্যকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়ার চেষ্টা চালায়।

চিত্র ১২.২২ : মা পাখি (ঘুঘু ও মুরগী) কর্তৃক ডিমে তা দেয়ার দৃশ্য

২। ডিমে তা দেওয়া (Incubation of eggs) : ডিম পাড়ার পর পিতা-মাতা সযত্নে ডিমে তা দিয়ে থাকে। কোনো কোনো প্রজাতিতে পিতা অথবা মাতা এককভাবে কাজটি সম্পন্ন করে। তবে সাধারণত মাতা কাজটি করে থাকে। তা দেওয়ার সময় পরম যত্নে বাবা মাকে খাইয়ে দেয়। বাচ্চা ফুটে বের হওয়ার (hatching) পূর্ব পর্যন্ত মা বাসা ছেড়ে মুহূর্তের জন্য বাইরে যায় না, তখন বাবা আশপাশে ঘুরে বেড়ায়। কিছু প্রজাতির ক্ষেত্রে পিতা-মাতা উভয়ই পর্যায়ক্রমে কাজটি সম্পন্ন করে। যেসব প্রজাতির পাখি মাটিতে ডিম পাড়ে তাদের ডিমের বর্ণের বৈচিত্র্য কম। তবে একটি বিষয় লক্ষণীয়, ডিমের রং মাটির বর্ণের সঙ্গে অর্থাৎ পরিবেশের সঙ্গে মিশে যায় (যেমন– কোয়েলের ডিম) যাতে শিকারি প্রাণী থেকে তাদের ডিম রক্ষা পায়, প্রকৃতপক্ষে এদের শিকারি (predator) বেশি থাকে। অপরপক্ষে, যারা গাছের শাখায় ডিম পাড়ে তাদের ডিমে বৈচিত্র্য বেশি লক্ষণীয়।

৩। ছানার যত্ন (Care of offspring) : শিকারি পাখি (যেমন- ঈগল, চিল, গাংচিল ইত্যাদি) গাছের উঁচু ডালে সাধারণত বাসা বাঁধে এবং সেখানে তাদের বাচ্চাদের লালন-পালন করে। বাচ্চাদের উড়াল শেখানোর জন্য বাচ্চার অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মা-বাবা ওপর থেকে বাচ্চাদের ছেড়ে দেয়, তখন পড়তে পড়তে শাবকরা উড়তে শেখে এবং স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। কিছু প্রজাতির পাখির অপত্য যত্ন খুবই লক্ষণীয়। এদের এরূপ যত্নকে brood parasitism বলে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোকিল সাধারণত কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, এমনকি ছোট ছোট পাখির বাসায়ও ডিম পাড়ে, অনেক সময় বাচ্চারা ডিমে তা দেওয়া পাখির চেয়েও বড় হয়ে থাকে। তবুও পরম যত্নে নিজের ডিম মনে করে তা দিয়ে থাকে, এমনকি ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়ে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন শুরু করার আগ পর্যন্ত বাচ্চাদের নিজের মনে করে যত্ন করে। ডিম ফোটার পরপরই কিছু প্রজাতির পাখি তাদের বাসা পরিষ্কার করে থাকে, যাতে বাচ্চারা রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত না হয়। ডিম ফুটে যখন বাচ্চারা (young birds) বের হয় তখন কিছু বাচ্চা সম্পূর্ণভাবে পিতা-মাতার ওপর নির্ভরশীল হয় এবং কিছু বাচ্চা সঙ্গে সঙ্গেই বাসা ত্যাগ করে এবং নিজেদের খাবার খুঁজতে থাকে।

বাচ্চাদের আচরণের ওপর ভিত্তি করে এদেরকে সাধারণত দুটি গ্রুপে বিভক্ত করা যায়। যথা– অ্যাল্ট্রিসিয়াল (altricial) এবং প্রিকোসিয়াল (precocial)।

১। অ্যাল্ট্রিসিয়াল (Altricial) : এই গ্রুপের বাচ্চারা অসহায়ভাবে জন্মলাভ করে থাকে অর্থাৎ এরা পালকহীন বা নগ্ন, অন্ধ ও অসহায় থাকে। পিতা-মাতা বাচ্চাদের খাবার খাওয়া থেকে উড়াল দেওয়াও (fledging) শিখিয়ে দেয়। এরা পিতা-মাতার পরম যত্নে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা স্বাবলম্বী না হয়। অ্যাল্ট্রিসিয়াল ছানারা নিজেদের দেহের ওজনের চেয়ে বহুগুণ বেশি খাবার খেয়ে থাকে যাতে তারা দ্রুত বেড়ে উঠতে পারে এবং বাসা ত্যাগ করতে পারে। যেমন– Songbirds, Woodpeckers, Hummingbirds, Pigeons (কবুতর) এবং America Robins পাখির বাচ্চা।

চিত্র ১২.২৩ : অ্যাল্ট্রিসিয়াল ও প্রিকোসিয়াল ছানা

২। প্রিকোসিয়াল (Precocial) : এই গ্রুপের বাচ্চারা ডিম ফুটে বের হওয়ার পর পরই তাড়াতাড়ি বাসা ত্যাগ করে। তারা পিতা-মাতাকে অনুসরণ করে এবং তারা নিজেরাই খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। এরা মাতাপিতার সাথে অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন– হাঁস-মুরগির বাচ্চা ইত্যাদি।

রোদ-বৃষ্টি থেকে নিরাপদ রাখার জন্য, শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, বাচ্চার খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য পাখিকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। বিভিন্ন প্রজাতির পাখিরা তাদের বাচ্চাদের খাওয়ানোর (feeding young) ব্যাপারে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকে। Pettingill (১৯৮৫)-এর মতে, প্রায় সকল গ্রুপের পাখিই পিতা অথবা মাতা অথবা উভয়েই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার পর পরই বাচ্চাদের খাবার দিয়ে থাকে বা খাবার খাইয়ে থাকে। কিছু পাখি তার ঠোঁট বা চঞ্চুতে (beak/bill) খাবার নিয়ে আসে এবং বাচ্চারা মুখ খুললে খাবার প্রবেশ করিয়ে দেয়। যেমন– অধিকাংশ passerines. কিছু পাখি খাবারকে চূর্ণ-বিচূর্ণ (regurgitate) করে বাচ্চাদের মুখে বা গলার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়। যেমন– Waxwings, Hummingbirds এবং Herons। কিছু পাখি খাবার বাসায় অথবা বাসার আশপাশে রাখে যাতে বাচ্চারা তুলে খেতে পারে। মা সাধারণত খাইয়ে দেয় না, খাওয়া শিখিয়ে দেয়। মা পাখি খাবারের দিকে ঠোকর দিয়ে খাবার দেখিয়ে দিলে বাচ্চারাও সে খাবারে ঠোকর দিয়ে থাকে। এভাবে তারা খাবার খাওয়া শিখে। যেমন– Gulls।

চিত্র ১২.২৪ : মা পাখি কর্তৃক ছানাকে খাওয়ানোর দৃশ্য

কিছু পাখি মুখে খাবার জমা রাখে এবং বাচ্চারা সেখান থেকে খাবার গ্রহণ করে। যেমন– Pelicans, Cormorants ইত্যাদি। কয়েক প্রজাতির বাচ্চারা পিতা-মাতার উগরে দেওয়া চর্বিবৎ, দইয়ের ন্যায় ক্ষরণ দুধ খেয়ে থাকে। এ দুধ পিতা-মাতার ক্রপের দুগ্ধ গ্রন্থি থেকে তৈরি হয়। যেমন– কবুতর (pigeons)এবং ঘুঘু (doves)। কিছু পাখি তাদের বাঁকা নখরের (hooked claw/talons) মাধ্যমে খাবার বাসায় নিয়ে আসে এবং টুকরা টুকরা করে বাচ্চাদের খাইয়ে থাকে (যেমন– Raptors with young nestling) অথবা আস্ত খাবারটি বাচ্চাদের দিয়ে থাকে (Raptors with older nestling)।

হেরিং গাল বা সমুদ্র চিলের (Herring gull or Sea gull) অপত্য লালন : নিকো টিনবারজেন (Niko Tinbergen, 1953) হেরিং গালের (*Larus argentatus*) চমকপ্রদ অপত্য লালনের তথ্য প্রদান করেন। বসন্তকালে এরা প্রজননের উদ্দেশ্যে জোড় বাঁধে এবং দু'জনে মিলে মোহনা কিংবা সমুদ্র উপকূলের বালুকাময় স্থানে বাসা তৈরি করে। এরা দলবদ্ধ হয়ে বাস করে বলে এদের বাসাগুলো কলোনির মতো দেখায়। বাসায় স্ত্রী পাখিটি ডিম পাড়ার পর পরই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই পালাক্রমে ডিমে তা দেয়। এরা কখনো ডিম ফেলে একসাথে কোথাও যায় না। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার পর পরই এদের প্রকৃত অপত্য লালন শুরু হয়। প্রস্ফুটনের কিছুক্ষণ পরই এদের বাচ্চাগুলো খাদ্যের জন্য পিতা-মাতার কাছে আবেদন জানাতে থাকে। পিতা-মাতা খাদ্য খাওয়ার সুযোগ করে দিলে বাচ্চারা পিতা-মাতার শেখানো পদ্ধতিতে চঞ্চু উঁচু করে ঠোকর দিয়ে খাওয়ার কৌশল রপ্ত করে ফেলে। কলোনির নিকট কোনো শত্রু বা আগন্তুকের অনুপ্রবেশ বুঝতে পারলে পিতা-মাতা ও বাচ্চাদের মধ্যে ভিন্নধর্মী সম্পর্ক গড়ে উঠে। এসময় কলোনির বয়স্ক সদস্যরা তাদের সুপরিচিত স্বভাবসিদ্ধ সংকেত ধ্বনি গা-গা-গা। গা-গা-গা-গা-গা শব্দ উচ্চারণ করে উড়ে যায়। এতে বাচ্চারা দৌড়ে কোনো নিরাপদ বা গুপ্তস্থানে লুকিয়ে পরে। এ সময় কলোনির বয়স্ক সদস্যরা সবাই উপরে উড়তে থাকে এবং আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়। প্রতিটি যুগল স্বতন্ত্রভাবে আগন্তুকের উপর আক্রমণ চালায়। এছাড়া অনেক সময় এরা আগন্তুকের উপর বমি ও মল ত্যাগ করে কিংবা পায়ের নখর দিয়ে আঘাত করে। এভাবে হেরিং গাল তাদের বাচ্চাদেরকে রক্ষা করে। বাচ্চাগুলো ক্রমে স্বাধীন হতে শিখলে পিতা-মাতা এদের ছেড়ে পূর্বের দলে ভিড়ে যায়।

চিত্র ১২.২৫ : হেরিং গালের প্রজনন আচরণ

মাছ, ব্যাঙ ও পাখির অপত্য যত্ন সম্পূর্ণরূপে হরমোন নিয়ন্ত্রত সহজাত আচরণ। এটি ডিম উৎপাদন থেকে শুরু হয় এবং বাচ্চা স্বনির্ভর না হওয়া পর্যন্ত চলে।

❑ **কাজ :** (i) স্টিকলব্যাক পুরুষ মাছ জিগ-জ্যাগ নৃত্য প্রদর্শন করে স্ত্রী মাছকে প্রজননে আকৃষ্ট করে- লাইনটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। (ii) মাছের ডিমপাড়ার পর তার রক্ষণাবেক্ষণের আচরণটি ব্যাখ্যা কর। (iii) উভচরের অপত্য স্নেহের সাথে মাছের অপত্য স্নেহের তুলনামূলক আলোচনা কর। (iv) পাখির 'অপত্য লালন' বিশ্লেষণ কর।

১২.৪ শিখন বা শিখন আচরণ (Learning or Learning behaviour)

কথায় বলে, যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি। মানুষের শেখার শেষ নেই। অন্যান্য প্রাণীও তাদের জীবদ্দশায় অনেক কিছু শিখে থাকে। **প্রাণীর যে আচরণ শিক্ষণ, প্রচেষ্টা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়, তাকেই শিখন বা শিখন আচরণ বা শিক্ষালব্ধ আচরণ** (learning behaviour) বলা হয়। এই আচরণ সকল স্তরের শিক্ষার অভিজ্ঞতাকেই ব্যাখ্যা করে। প্রাণীর শিখন আচরণ পরিবর্তনশীল, কারণ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং পরিবেশ থেকে প্রাণী সর্বদাই কিছু না কিছু অর্জন করতে থাকে। বিভিন্ন বিজ্ঞানী শিখন বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন–

- শিখন হলো আচরণের পরিবর্তন (Watson & Bernad)
- শিখন হলো অভ্যাসের ফলে ক্রিয়ার পরিবর্তন (Mac Goach)
- শিখন হলো অতীত অভিজ্ঞতা অনুশীলনের ফলস্বরূপ আচরণের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তন (Morgan & King)
- যেসব আচরণ অর্জিত এবং অভিজ্ঞতার আলোকে পরিবর্তিত হতে পারে তাদের শিখন আচরণ বলা হয় (A adaptive change in behaviour that results from experience) – Lorenz.

তবে অনুশীলন বা অভিজ্ঞতা ছাড়া শারীরিক সমস্যার (যেমন– দুর্ঘটনা বা রোগ) কারণে আচরণের পরিবর্তন হ তাকে শিখন বলা যাবে না।

শিখন আচরণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Learning behaviour)

(১) শিখন আচরণ জটিল প্রকৃতির, যাহা শিখার মাধ্যমে অর্জিত হয়। (২) এ আচরণ স্বভাবজাত নয়, এমনকি প্রজাতি সুনির্দিষ্ট নয়। (৩) এই আচরণ সর্বদা পরিবর্তনশীল এবং অভিযোজনীয়। (৪) এ আচরণ প্রদর্শনের জন্য অভিজ্ঞতা এবং অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। (৫) এটি উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নতুন সম্পর্ক স্থাপন করে। (৬) সাধারণত উচ্চশ্রেণির প্রাণীতে এই আচরণ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু বংশপরম্পরায় প্রদর্শিত হয় না।

শিখন আচরণের শর্ত বা উপাদান (Factors of learning behaviour) : এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া, যা বিভিন্ন শর্ত বা উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। শিখনের সাধারণ শর্তগুলো হলো– সমস্যা (problem), প্রেষণা বা প্রেরণা বা মোটিভেশন (motivation), অনুষঙ্গ (association), বলবৃদ্ধি (reinforcement), পর্যবেক্ষণ (observation), মনোযোগ (attention), পুনঃপুনঃ প্রচেষ্টা (repeated trials), সান্নিধ্য (contiguity)।

শিখন আচরণের প্রকারভেদ (Types of learning behaviour) : বিখ্যাত আচরণবিদ Thorpe (১৯৬৩) প্রদত্ত প্রকারভেদটি নিম্নরূপ :

(১) অভ্যাসগত (Habituation); (২) অনুকরণ (Imprinting); (৩) অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন (Insight learning); (৪) প্রচ্ছন্ন বা সুপ্ত শিখন (Latent learning); (৫) চিরায়ত সাপেক্ষণ (Classical conditioning) এবং (৬) প্রচেষ্টা বা ভুল সংশোধনকরণ শিখন বা যান্ত্রিক শিখন (Trial and error or Instrumental learning)। এ ছয়টি শিখন আচরণের মধ্যে **অভ্যাসগত** ও **অনুকরণ** শিখন আচরণ সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত।

১। অভ্যাসগত (Habituation) : জীবনব্যাপী প্রাণীর ক্ষেত্রে এ ধরনের সরল প্রকৃতির শিখন আচরণ লক্ষ করা যায়। যদি কোনো প্রাণীকে ক্রমাগত একটি বিশেষ উদ্দীপকের মাধ্যমে উদ্দীপিত করা হয় (যে উদ্দীপকের সঙ্গে কোনো লাভ বা ক্ষতি সংশ্লিষ্ট নয়) তাহলে প্রাণীটি উদ্দীপকের প্রতি সাড়া প্রদর্শনের মাত্রা কমিয়ে দেয়।

এরূপ বারবার কোনো উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করতে করতে অবশেষে প্রাণী যে প্রতিক্রিয়া হ্রাস করতে শেখে তাকে অভ্যাসগত আচরণ (habituation) বলে। এতে কোনো নতুন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না, বরং পুরাতনটি লোপ পায়। যেমন– চলনরত কোনো শামুকে কাঠি দ্বারা স্পর্শ করলে সে নিজেকে খোলকের মধ্যে গুটিয়ে নেয়, কিন্তু বারংবার স্পর্শ করতে থাকলে একসময় দেখা যায় সে নিজেকে আর গুটিয়ে নিচ্ছে না। অর্থাৎ অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে এবং সে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না। অভ্যাসগত কারণে কারখানাতে শ্রমিকরা শব্দময় পরিবেশে কাজ করতে পারে।

২। অনুকরণ (Imprinting) : এ ধরনের আচরণ এক অভিনব শিখন আচরণ। তরুণ প্রাণীর বর্ধনের অতি সংবেদনশীল মুহূর্তে (sensitive period) এ ধরনের শিখন সুস্পষ্টরূপে লক্ষ করা যায়। সাধারণত খাদ্য, দেহের উষ্ণতা প্রভৃতি দ্বারা জীবনের সূচনালগ্নে এ জাতীয় শিখনের সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়।

চিত্র ১২.২৬ : লরেঞ্জের পালিত হাঁস

বিশিষ্ট প্রাণিবিজ্ঞানী **কনরাড লরেঞ্জ** (১৯৩৭) প্রাকৃতিক পরিবেশে সংঘটিত ইমপ্রিন্টিং-এর একটি চমৎকার ঘটনা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ধূসর পা রাজহংসী বা পাতিহাঁস জীবনে প্রথম যাকে দেখে সবসময় তাকেই অনুসরণ করে, কিন্তু মা-বর্জিত রাজহংসীর বাচ্চারা যারা প্রথম লরেঞ্জকে জন্মের পর দেখেছে তারা বরাবরই লরেঞ্জকে বিকল্প মা ভেবে পিছু নিয়েছে। অনেক সময় দেখা যায়, পাখির বাচ্চাকে মানুষের ভাষা শেখানো হলে সে তার নিজের ভাষা ভুলে যায়। এ ধরনের আচরণ ইমপ্রিন্টিং-এর অন্তর্ভুক্ত।

৩। অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন (Insight learning) : পরিস্থিতি অনুযায়ী সমাধান বের করাই হলে অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন। বিজ্ঞানী Wolfgang kohler পরীক্ষা করে দেখেন শিম্পাঞ্জির খাঁচায় অনেকগুলো বাক্স রেখে তার নাগালের অনেক বাইরে কলা টানিয়ে রাখা হলে শিম্পাঞ্জি বাক্সের উপর বাক্স সাজিয়ে স্তূপ তৈরি করে এর উপর দাঁড়িয়ে কলা খায়। অর্থাৎ নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে সে সমস্যা সমাধান করে।

৪। প্রচ্ছন্ন বা সুপ্ত শিখন (Latent learning) : কোনো বৈশিষ্ট্য যখন প্রচ্ছন্ন বা সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং পারিপার্শ্বিক কোনো অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রকাশ পায় তাকে প্রচ্ছন্ন বা সুপ্ত শিখন বলে।

৫। চিরায়ত সাপেক্ষণ (Classical conditioning) : শর্তাধীন সাড়া দিয়ে অর্জিত শিখন আচরণকে চিরায়ত সাপেক্ষণ শিখন বলে। যেমন– মুরগিকে খাবার দেওয়ার সময় নিয়মিত নির্দিষ্ট শব্দ করলে পরবর্তীতে খাবার না দিয়ে শব্দ করলেও মুরগি সাড়া প্রদান করবে।

৬। প্রচেষ্টা বা ভুল সংশোধনকরণ শিখন (Trail and error learning) : ভুল সংশোধনের মাধ্যমে প্রাণী যে শিক্ষালাভ করে তাকে ভুল সংশোধনকরণ শিখন বলে। যেমন– ব্যাঙ মিলিপোডকে দেখামাত্র প্রথমে মুখে নিয়ে নেয়। কিন্তু যখন মিলিপোড বিষ নিঃসরণ করে তখন ব্যাঙ বুঝতে পারে এটি তার খাদ্য নয় এবং পরবর্তীতে আর সে মিলিপোড শিকার করে না।

সহজাত আচরণ এবং শিখন আচরণের মধ্যে পার্থক্য

সহজাত আচরণ	শিখন আচরণ
১। এটি সরল প্রকৃতির এবং বংশগতির ধারা অনুযায়ী জন্মগতভাবে অর্জিত হয়।	১। এটি জটিল প্রকৃতির এবং অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত হয়।
২। এটি স্বভাবজাত।	২। এটি স্বভাবজাত নয়।
৩। বুদ্ধির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।	৩। বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।
৪। এটি প্রজাতি সুনির্দিষ্ট।	৪। এটি প্রজাতি সুনির্দিষ্ট নয়।
৫। অভিযোজনের পরিপ্রেক্ষিতে বিকাশ লাভ করে না।	৫। এটি অভিযোজনমূলক পরিবর্তনের ফল। যা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল।
৬। নিরপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া (unconditioned reflex) দ্বারা প্রভাবিত হয়।	৬। সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া (condition reflex) দ্বারা প্রভাবিত হয়।
৭। এ আচরণ বংশপরম্পরায় প্রদর্শিত হতে থাকে।	৭। এ আচরণ সাধারণত বংশপরম্পরায় প্রদর্শিত হয় না।
৮। সকল শ্রেণির (উচ্চ ও নিম্ন) প্রাণীতে এ আচরণ দেখা যায়।	৮। সাধারণত উচ্চ শ্রেণির প্রাণীতে এ আচরণ দেখা যায়।

১২.৫ Pavlov-এর তত্ত্ব (Therory Of Pavlov)

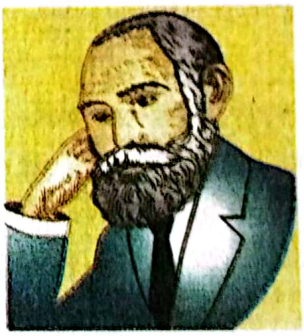
বিজ্ঞানী প্যাভলভ

আইভান পেট্রোভিচ প্যাভলভ (Ivan Petrovich Pavlov, 1849-1936) স্বনামধন্য একজন রাশিয়ান শারীরবিদ। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য ১৯০৪ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তার অন্যতম গবেষণাকর্মের বিষয় ছিল রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ভেগাস স্নায়ুর প্রভাব অত্যধিক। পরিপাকের শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি নিয়ে তিনি উঁচুমানের গবেষণা পরিচালনা করেন। ঘণ্টা ধ্বনির সঙ্গে কুকুরের লালা নিঃসরণ সংক্রান্ত তাঁর পরীক্ষা শিখন আচরণের এক বিস্ময়কর ঘটনা। প্যাভলভের **সাপেক্ষ প্রতিবর্তী মতবাদ** (Conditional reflex theory) শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

এই মতবাদের মূল কথা হলো– **'পূর্বে যে প্রতিক্রিয়াটি একটি স্বাভাবিক উদ্দীপক দ্বারা সৃষ্টি হতো, স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে একটি সাপেক্ষ জুড়ে দেওয়ার ফলে সাপেক্ষ উদ্দীপকটিও ওই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।'**

কুকুরের লালার প্রতিবর্তী ক্রিয়া (Reflex Action by Dog's Saliva)

বিজ্ঞানী প্যাভলভ কুকুরের পরিপাকের শারীরবৃত্ত নিয়ে গবেষণা করেন। কুকুরের খাবার পরিবেশন করতেন নির্দিষ্ট টেকনিশিয়ান। প্যাভলভ লক্ষ করলেন যে শুধু খাবার দেখলেই কুকুরের লালাক্ষরণ হয় না টেকনিশিয়ানের গায়ের সাদা গবেষণা কোট দেখলেই লালাক্ষরণ শুরু হয়ে যেত। এ থেকে তিনি ধারণা করেন যে, কুকুরকে খাবার প্রদানের সময় যদি কুকুরের চারপাশে সুনির্দিষ্ট উদ্দীপনা থাকে তাহলে তা খাবারের সাথে মিশে কুকুরের লালাক্ষরণকে উদ্দীপ্ত করে।

চিত্র ১২.২৭ : প্যাভলভের পরীক্ষা

এছাড়াও বিজ্ঞানী প্যাভলভ কুকুরের লালার প্রতিবর্তী ক্রিয়ার মাধ্যমে সাপেক্ষ প্রতিবর্তের একটি সুন্দর উদাহরণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি একটি কুকুরকে প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে খাবার (মাংসের টুকরা) দিতেন। ওই সময় কুকুরের লালা নিঃসরণ হতো (অনপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া) পরে তিনি খাবার দেওয়ার সময় একটি ঘণ্টা বাজাতেন।

কয়েকদিন অনুশীলনের পর তিনি নির্দিষ্ট সময়ে খাবার দেওয়ার পরিবর্তে কেবল ঘণ্টাধ্বনি করলেন তাতেও কুকুরটির লালা নিঃসরণ হতে দেখা গেল।

এখানে ঘণ্টাধ্বনি শোনা সত্ত্বেও কুকুরের প্রতিবর্ত ঘটেছে, ফলে লালাক্ষরণ হয়েছে। এই প্রকার প্রতিবর্তী ক্রিয়া সাপেক্ষ বা শর্তাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়ার উদাহরণ। এইরকম নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্যগ্রহণ, ঘুমানো, মলত্যাগ ইত্যাদি সাপেক্ষ বা অর্জিত প্রতিবর্তী ক্রিয়ার উদাহরণ। সার্কাসে আমরা যে দড়ি বা রিং-এর খেলা দেখি এগুলো বারবার অভ্যাস বা অনুশীলনের দ্বারা আয়ত্ত করা হয়েছে। এগুলোও একপ্রকারের সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া। অর্থাৎ **সাপেক্ষ উদ্দীপকের প্রতি প্রাণী যে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে তাই সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া**। বিজ্ঞানী প্যাভলভের প্রতিবর্তী ক্রিয়াকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপন করা যায় :

শিখনের পূর্বে	সাপেক্ষ উদ্দীপক (ঘণ্টাধ্বনি)	সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (লালা ঝরেনি)
	স্বাভাবিক উদ্দীপক (মাংসের টুকরা)	স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (লালা নিঃসরণ)
শিখনের সময়	সাপেক্ষ উদ্দীপক + স্বাভাবিক উদ্দীপক	স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (লালা নিঃসরণ)
শিখনের পর	সাপেক্ষ উদ্দীপক	সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (লালা নিঃসরণ)

❑ **কাজ :** কুকুরের লালা নিঃসরণজনিত আচরণ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ– মূল্যায়ন কর।

১২.৬ সামাজিক আচরণ (Social Behaviour)

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ যেমন সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, তেমনি প্রায় সকল জীব জীবনের কোনো এক পর্যায়ে যুগলবদ্ধ হয়ে বা যুথবদ্ধভাবে জীবনযাপন করে। মৌমাছি, পিঁপড়া, উইপোকা, বোলতা, মাছ, পাখি, হরিণ, বানর ইত্যাদি প্রাণীর ক্ষেত্রে যুথবদ্ধ জীবনযাপন সামাজিক আচরণে উন্নীত হয়েছে। সামাজিক আচরণে একই প্রজাতিভুক্ত জীবের বিভিন্ন সদস্য একে অন্যের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং প্রত্যেকে পরস্পরের সহযোগী। প্রজননকালে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে গড়ে ওঠা সরল এবং সংক্ষিপ্ত **আন্তঃক্রিয়া** বা **মিথস্ক্রিয়া** (interaction) থেকে শুরু করে স্থায়ী জটিল সমাজবদ্ধ জীবনযাপন প্রণালি পর্যন্ত এ জাতীয় আচরণ বিস্তৃত। যেমন– অভিপ্রয়াণ (migration), নিজস্ব অধিকারাধীন এলাকার প্রতিরক্ষা (territorial defence), প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই (fighting), ঝাঁক বাঁধা (flocking), পাল গঠন (herding) ইত্যাদি কাজের মধ্য দিয়ে প্রাণীদের ভেতর সামাজিক আচরণের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়।

কোনো এক প্রাণিগোষ্ঠীর সামাজিক সংগঠন (social organization) তাদের মোট সংখ্যা, বয়স, লিঙ্গ, স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত ইত্যাদি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। এ বিষয়গুলো আবার কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক বা প্রভাবক (factors), যেমন– জনসংখ্যার আধিক্য, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের প্রাপ্যতা, খাদকের চাপ (predation pressure), বসতির ধরন (types of habitat) ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনা করলে দলবদ্ধ সকল জীবগোষ্ঠীকে প্রকৃত সামাজিক জীব বলা যায় না। কারণ শুধুমাত্র সমষ্টিবদ্ধ জীবনযাপন আর প্রকৃত সমাজবদ্ধ জীবনযাপনের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। কেবলমাত্র বাহ্যিক প্রভাবক বা নিয়ামকের পরিপ্রেক্ষিতে একাধিক প্রাণী মিলে সমষ্টিবদ্ধ হওয়াকে **দলবদ্ধতা** (aggregation or association) বলা হয়। যেমন– যৌন মিলনের জন্য আলোর চারদিকে কীটপতঙ্গ জমা হওয়া অথবা আর্দ্রতার জন্য নুড়িপাথরের নিচে কেঁচোর ভিড় জমা। কিন্তু প্রকৃত সমাজবদ্ধ জীবের মধ্যে পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ায় বা মিথস্ক্রিয়া খাদ্যের বিনিময়, দৈহিক সেবা যত্ন (body care), যৌন আনুকূল্য (sexual favours) ইত্যাদি পাওয়া যায়।

সামাজিক সংগঠন ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী, ঋতুকালীন (seasonal), মৌসুমি বা বার্ষিক হতে পারে। সাংগঠনিক দিক থেকে সামাজিক মেরুদণ্ডী প্রাণীরা সামাজিক কীটপতঙ্গকুল থেকে পৃথক। কারণ, মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সামাজিক গোষ্ঠীতে প্রজননকারী সদস্য সংখ্যার অনুপাত কীটপতঙ্গের চেয়ে অনেক বেশি থাকে এবং এখানে কোনো বন্ধ্যা সদস্যের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

সামাজিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Social being)

(১) নির্দিষ্ট সামাজিক প্রাণিগোষ্ঠীতে একই প্রজাতির অনেক সদস্য সক্রিয়ভাবে একত্রিত হয়ে পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে। (২) যূথবদ্ধতা ক্ষুদ্রতম সামাজিক গোষ্ঠী একটিমাত্র পুরুষ ও স্ত্রী সদস্য নিয়ে গঠিত হতে পারে, যারা কেবল প্রজননকালে আন্তঃক্রিয়া করে। (৩) সামাজিক সংগঠনে এবং আচরণে শ্রমবিভাজন অত্যন্ত স্পষ্ট। (৪) সামাজিক গোষ্ঠীতে বিভিন্ন প্রজাতির জনুর অধিঃক্রমণ (overlaping of generations) স্বাভাবিক ঘটনা। অর্থাৎ পরিবার বা পরিবারের অংশ একত্রে অবস্থান করে। এক্ষেত্রে পিতা-মাতা অপরিণত সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। আর উন্নত অবস্থায় তিন বা ততোধিক জনু সারা বছর ধরে অথবা কিছু কিছু প্রাণীতে জীবনব্যাপী একত্রে অবস্থান করে।

অ্যালট্রুইজম (Altruism) : পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা বা সহমর্মিতা বা পরার্থপরতা

ফ্রেঞ্চ *altruisme* এবং ইতালীয় *altrui* থেকে altruism শব্দটির উদ্ভব, যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পরার্থবাদ বা পরার্থিতা। The principles of living and acting for the interest of others অর্থাৎ কিছু সংখ্যক জ্ঞাতিকে (kin) সুবিধা করে দিতে গিয়ে অনেকে আত্মত্যাগ করে, এমনকি আত্মাহুতিও দিয়ে থাকে। এ রকম আচরণের মূল কথা হচ্ছে পরার্থিতা। **সন্তান-সন্ততিকে লালন-পালন করতে গিয়ে পিতা-মাতার আত্মত্যাগ, শত্রুর আক্রমণ থেকে অধঃবংশ রক্ষা করতে গিয়ে পিতা-মাতার মৃত্যুবরণ প্রভৃতিকে পরার্থিতা বা অ্যালট্রুইজম বলে।** যেসব জীব ত্যাগ স্বীকার করে বা আত্মাহুতি দেয় তাদের জিনোটাইপ টিকে থাকে তাদের জ্ঞাতিদের মধ্যে। যেমন– পিতার অর্ধেক জিন তার সন্তানদের মধ্যে এবং প্রায় একই জিনোটাইপ বেঁচে থাকা ভাই-বোনদের মধ্যে টিকে থাকে। ফরাসি দার্শনিক **August Comte** (1851) সর্ব প্রথম Altruism শব্দটি প্রণয়ন করেন।

পিঁপড়া, মৌমাছি, বোলতা প্রভৃতি সামাজিক প্রাণীর আচরণেও **অ্যালট্রুইজম** (altruism) লক্ষ করা যায়। যেমন– মৌমাছির ক্ষেত্রে, পুরুষ কর্মীরা মৌচাক গড়ে, নবজাতক ও শিশুদের লালন-পালন করে, খাদ্য সংগ্রহ করে অর্থাৎ মৌচাকের প্রায় সকল কাজই তারা করে। কিন্তু তারা অনুর্বর (sterile)। তাই তারা কোনো অধঃবংশ রেখে যেতে পারে না। কলোনির হাজার হাজার মৌমাছির মধ্যে একমাত্র উর্বর সদস্য হচ্ছে **স্ত্রী মৌমাছি অর্থাৎ রানী** (Queen)। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, একমাত্র রানীর জন্য কলোনির অন্য সকল সদস্য আত্মত্যাগ করছে। অ্যালট্রুইজমের উদাহরণস্বরূপ মৌমাছির সামাজিক সংগঠন আলোচনা করা হলো।

মৌমাছির সামাজিক সংগঠন (Social Organisation of Honey Bee)

মৌমাছি Arthropoda পর্বের Insecta শ্রেণির Hymenoptera বর্গের Apidae গোত্রভুক্ত অতি পরিচিতি একটি সামাজিক পতঙ্গ। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে *Apis* গণভুক্ত তিন প্রজাতির মৌমাছি শনাক্ত করা হয়েছে। যথা– *Apis indica, A. dorsata* ও *A. florea*। ইউরোপ ও আফ্রিকায় প্রাপ্ত মৌমাছির প্রজাতি হলো যথাক্রমে *Apis mellifera* ও *A. adamsoni*। মৌমাছি একটি অতি পরিচিত সামাজিক পতঙ্গ। এরা দলবদ্ধভাবে মৌচাকে বাস করে। একটি মৌচাকে হাজার হাজার মৌমাছি বাস করে। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, এরা সুনির্দিষ্ট শ্রমবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজ নিজ কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধাপূর্বক তাদের নিয়মতান্ত্রিক সামাজিক জীবন পরিচালনা করে থাকে। সামাজিক জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে মৌমাছিদের নিম্নলিখিত সামাজিক আচরণ দেখা যায় :

১। **বাসা তৈরি** : সামাজিক আচরণের মধ্যে বাসা তৈরি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আচরণ। মৌমাছিদের বাসাকে **মৌ-কলোনি বা মৌচাক** (bee colony or honey comb) বলে। এরা নিরাপদ জায়গায় যেমন উঁচু গাছের ডালে, গাছের কোটরে, বাড়ির কার্নিশে বা মাটির দেয়ালের ফাটলে বাসা তৈরি করে। উল্লেখ্য *Apis indica* ও *A. dorsata* গাছের ফোকর, গাছের ডাল, দালান বা ঘরের সুবিধাজনক স্থানে বাসা তৈরি করে। তবে এরা বছরে একবার মাইগ্রেশন করে পাহাড়ী এলাকায় চলে যায়। *Apis flora* ঘরের কার্নিশে বা গাছের ডালে বাসা তৈরি করে। শ্রমিক মৌমাছিদের মোমগ্রন্থি নিঃসৃত মোম দিয়ে মৌচাক তৈরি হয়। মৌচাকে অসংখ্য অনুভূমিক প্রকোষ্ঠ থাকে। চাকের উপরের প্রকোষ্ঠগুলোতে মধু ও পরাগ সঞ্চিত থাকে এবং নিচের প্রকোষ্ঠগুলোতে ডিম, লার্ভা ও পিউপা দশা থাকে। এ প্রকোষ্ঠগুলোর মধ্যে বড়গুলো রানী কুঠুরি। উল্লেখ্য, পূর্ণাঙ্গ মৌমাছিরা প্রকোষ্ঠের মধ্যে থাকে না, বাইরে থাকে।

২। **বৃহত্তর জনসংখ্যা :** একটি সামাজিক দলে বিভিন্ন কাজকর্ম করার জন্য পর্যাপ্ত সদস্যের প্রয়োজন হয়। একটি মৌচাকে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ হাজার বা তারও অধিক সংখ্যক মৌমাছি থাকে। তবে একটি মৌচাকের সকল সদস্য পূর্বতন একটি মাত্র রানীর সন্তান। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, এক মৌচাকের মৌমাছিকে অন্য মৌচাকের সদস্য করে নেওয়া হয় না।

৩। **বহুরূপিতা :** একটি মৌচাকে তিন জাতের বা **কাস্টের** (caste) সদস্য মৌমাছি দেখা যায়। যেমন– একটি রানী (queen), কয়েকশত **পুরুষ** (drone) এবং কয়েক হাজার **কর্মী** বা **শ্রমিক** (worker)। শ্রমবণ্টনের ভিত্তিতে এদের দৈহিক গঠনের পার্থক্য দেখা যায়। এদের এরূপ অবস্থাকে **বহুরূপিতা** (polymorphism) বলে।

(ক) **রানী মৌমাছি** (Queen Bee) : মৌমাছির মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় রানীই সমাজের মধ্যমণি। প্রত্যেকটি কলোনিতে ২০০-৩০০ পুরুষ ও ১০,০০০-৮০,০০০ কর্মী মৌমাছি থাকে এবং কলোনিটি ১টি মাত্র রানীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। কলোনির অন্যান্য সদস্য অপেক্ষা রানীর দেহ অনেক বড়, দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫-২০ মিলিমিটার। এদের পা খর্বাকার কিন্তু মজবুত, উদর প্রলম্বিত, উদরের শেষভাগ ক্রমশ সরু। দেহের তুলনায় ডানা দুটি ছোট। এদের ম্যান্ডিবল (mandible) সুচালো এবং মুখোপাঙ্গ খাটো। হুলে বার্ব না থাকায় এরা বার বার হুল ফুটাতে পারে। এদের লালাগ্রন্থি থাকে না। উদরের শেষভাগে বাঁকানো হুলের মতো ডিম্ব প্রতিস্থাপন যন্ত্র ওভিপোজিটর (ovipositor) থাকে, যা আত্মরক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়। সঙ্গমের পর রানী দিনে ১,৫০০-২০০০ ডিম পাড়তে সক্ষম। ডিমগুলো নিষিক্ত বা অনিষিক্ত হতে পারে। ডিম নিষিক্তকরণ সম্পূর্ণরূপে রানীর নিয়ন্ত্রণাধীন।

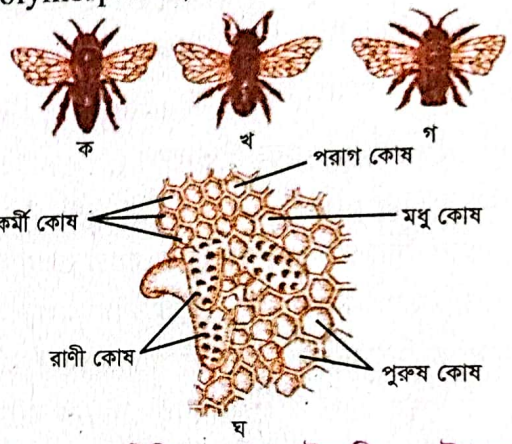

চিত্র ১২.২৮ : বিভিন্ন প্রকার মৌমাছি ও মৌচাকের অংশবিশেষ–
ক. রানী, খ. কর্মী, গ. পুরুষ, ঘ. মৌচাকের অংশবিশেষ

অনিষিক্ত ডিম থেকে **অপুংজনি** (parthenogenesis) পদ্ধতিতে পুরুষ মৌমাছির জন্ম হয়। এরা জিনগত দিক থেকে হ্যাপ্লয়েড এবং এদের ক্রোমোজোম সংখ্যা ১৬টি। আর নিষিক্ত ডিম থেকে ডিপ্লয়েড স্ত্রী মৌমাছির জন্ম হয় এবং এদের ক্রোমোজোম সংখ্যা ৩২টি। রানী ও শ্রমিক ভেদে লার্ভার খাদ্যের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। রানী মৌমাছিরা ৩-৫ বছর বাঁচে। রানী তার জীবদ্দশায় মাত্র একবার পুরুষ মৌমাছির সঙ্গে প্রজননে লিপ্ত হয়। ৪-১০ দিন বয়স্ক রানী মুক্ত আকাশে পুরুষের সঙ্গে মিলনে অংশগ্রহণ করে। আকাশে রানী ও পুরুষের মিলনকে **বৈবাহিক উড্ডয়ন বা নাপসিয়াল উড্ডয়ন** (naptial flight) বলে। সংগমকালে পুরুষ প্রায় দুই কোটি শুক্রাণু নিঃসরণ করে যেগুলো স্ত্রী স্পার্মাথিকায় বহুদিন ধরে সঞ্চিত ও কর্মক্ষম থাকে। তাই রানীর ইচ্ছামাফিক সঞ্চিত এ শুক্রাণু দ্বারা ডিম নিষিক্ত হয়।

রানী মৌমাছির ত্বক নিঃসৃত হরমোন গুণসম্পন্ন **অক্সোডিকেনইক এসিড** চাকের সর্বত্র বিসরিত হয়ে সকল মৌমাছির যাবতীয় কার্যকলাপ সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। রানী মৌমাছির ম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি (mandibular gland) থেকে Queen substance নামক এক বিশেষ ধরনের **ফেরোমন** (pheromone = oxydecenoic acid) নিঃসৃত হয়। এ ফেরোমন কর্মীদের জননাঙ্গের পরিপক্বতায় বাধা প্রদান করে। কলোনির প্রয়োজন অনুযায়ী রানী নিষিক্ত ও অনিষিক্ত ডিম পাড়ে কিংবা নতুন কলোনি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কিছু কর্মী পুরুষ মৌমাছিসহ অন্যত্র গমন করে। ভবিষ্যৎ রানীর লার্ভাগুলো তরুণ কর্মী মৌমাছির **গলবিল গ্রন্থি** (hypopharyngeal gland) ও ম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ **রয়াল জেলি** (royal jelly) খেয়ে বড় হয়, ফলে রানী মৌমাছিতে রূপান্তরিত হয়। এ ঘটনাকে **সুপার সিডিওর** (super sedure) বলে। [রয়েল জেলির রাসায়নিক উপাদান : পানি ৬৬.০৫%, প্রোটিন ১২.৩৪%, লিপিড ৫.৪৬%, অজৈব বস্তু ০.৯২% এবং ভিটামিন ও অন্যান্য বস্তু ২.৮০%] ১৬ দিনের মধ্যে মৌমাছিরা রানীকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলে। অপরপক্ষে শ্রমিক ও পুরুষ মৌমাছি লার্ভা অবস্থায় মধু ও **মৌরুটি** বা **বি-ব্রেড** (bee bread) খেয়ে বড় হয়। নতুন রানী বের হয়ে হুল ফুটিয়ে মৌচাকে বিকাশরত অন্যান্য রানীদের হত্যা করে। একই সময়ে দুটি নতুন রানী বের হলে এরা **মরণ যুদ্ধে** (duel to the death) লিপ্ত হয়। বিজয়ী রানী কলোনির সার্বিক দায়িত্বভার গ্রহণ করে। নতুন রানী বয়স্ক ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে কর্মী মৌমাছিরা তাকে মেরে ফেলে। ঝাঁক গঠনের সময় রানী সবসময় মৌচাকে অবস্থান করে।

কাজ : রানী মৌমাছির প্রধান কাজ ডিম পাড়া। এরা চাক নির্মাণ, মোম, মধু উৎপাদন এবং পরাগরেণু বা মকরন্দ বা পুষ্পসুধা (nectar) সংগ্রহ ইত্যাদি কোনো কাজেই অংশ নেয় না।

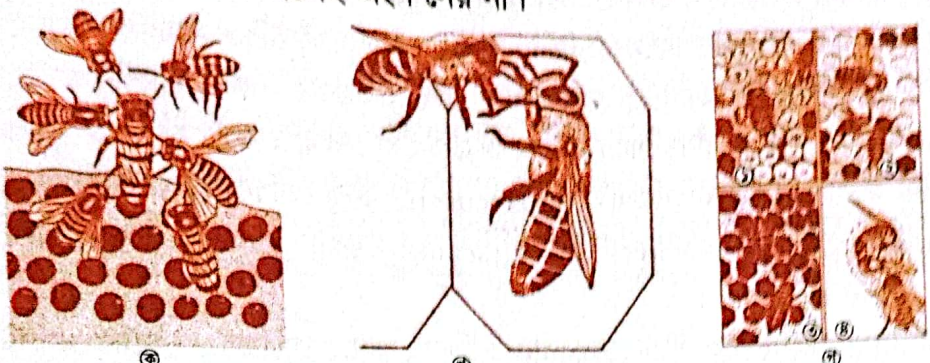

চিত্র ১২.২৯ : ক. রানী মৌমাছিকে পরিচর্যারত কর্মী মৌমাছি, খ. কর্মী মৌমাছি ড্রোন বা পুরুষকে খাদ্য প্রদান করছে, গ. কর্মী মৌমাছিদের বিভিন্ন কাজ : ১. লার্ভাকে খাদ্য প্রদান, ২. কুঠুরিতে পরাগ সঞ্চারণ, ৩. কুঠুরিতে মকরন্দ সঞ্চয়, ৪. উপনিবেশে প্রবেশকারী অচেনা মৌমাছিকে বাধাদান।

(খ) পুরুষ মৌমাছি (Drone) : পুরুষ মৌমাছি রানী অপেক্ষা আকারে কিছুটা ছোট এবং লম্বায় ১৫-১৭ মিলিমিটার। তবে এদের দেহ বেশ সুগঠিত। এরা শ্রমিকদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড়। এদের মোম গ্রন্থি, পরাগ সংগ্রাহক যন্ত্র এবং হুল থাকে না। এরা হ্যাপ্লয়েড ও উর্বর (fertile); রানীর সঙ্গে যৌন মিলনে অংশগ্রহণ করে। কলোনিতে ৩০০-৩০০০ পর্যন্ত পুরুষ বা ড্রোন মৌমাছি থাকে। উল্লেখ্য, চাকে অনেক পুরুষ থাকলেও একটি মাত্র পুরুষ রানীর সঙ্গে মিলনে অংশগ্রহণ করতে পারে। পুরুষ মৌমাছি ১০ দিন বয়সে স্ত্রী মৌমাছির সঙ্গে মিলনের উপযোগী হয় এবং এরা বৈবাহিক উড্ডয়নকালে রানীর সঙ্গে মিলিত হয়ে পর্যাপ্ত শুক্রাণু স্খলন করে। মিলনের ঠিক পরই পুরুষটি মারা যায়। সাধারণভাবে পুরুষের আয়ু ৫০-৬০ দিন পর্যন্ত হয়। এরা মৌচাকের অলস প্রকৃতির ও কোলাহল সৃষ্টিকারী সদস্য। পুরুষ মৌমাছিরা নিজেরা খাদ্য সংগ্রহে অক্ষম। কিন্তু এরা প্রচুর পরিমাণে খাবার আত্মসাৎ করে। কর্মী মৌমাছিরা প্রজনন ঋতুতে পুরুষদের যত্ন নেয়। খাদ্যের জন্য এরা কর্মী মৌমাছির ওপর নির্ভরশীল। চাকে খাদ্যের অভাব দেখা দিলে কর্মী মৌমাছিরা এদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে, এমনকি চাক থেকে বের করে দেয়। তখন এরা অনাহারে মারা যায়, এজন্য কখনো কখনো চাক পুরুষশূন্য হয়ে যায়। বর্ষা ও শীতে এরা উপনিবেশ থেকে বিতাড়িত হয়।

কাজ : পুরুষ মৌমাছি কেবল রানীর সঙ্গে প্রজননে অংশ নেয়। এরা মৌচাকের কোনো কাজ করে না। এমনকি মধু ও পরাগ সংগ্রহে অংশ নেয় না। তবে অন্য দলের মৌমাছির অনুপ্রবেশ ঘটলে নিজ কলোনিকে রক্ষার এবং কলোনির তাপ নিয়ন্ত্রণ করার কাজে এরা অংশগ্রহণ করে থাকে।

(গ) কর্মী মৌমাছি (Workers) : যেসব স্ত্রী লার্ভা কেবল মধু ও বি-ব্রেড (bee bread) বা মৌরুটি খেয়ে বড় হয় তারা বন্ধ্যা কর্মী মৌমাছিতে রূপান্তরিত হয়। এরা সংখ্যায় সর্বাধিক এবং কলোনির ক্ষুদ্রতম সদস্য। এরা কালো বা বাদামি বর্ণের হয়ে থাকে। কলোনির মোট মৌমাছির প্রায় ৯৯% কর্মী মৌমাছি। এদের ডিম্বাশয় সৃষ্টি হয় না, তাই বন্ধ্যা অর্থাৎ এরা প্রজননে অক্ষম। এদের ডানা দুটি বেশ মজবুত হয় ফলে দ্রুত ডানা সঞ্চালন করতে পারে। এদের পায়ে পরাগ সংগ্রহের থলি বা **পরাগঝুড়ি** (pollen basket) এবং **রেণু চিরুনি** (pollen comb) থাকে। এদের উদরের অঙ্কীয়দেশে মোম নিঃসরণের জন্য **মোমগ্রন্থি** (wax gland) থাকে। দেহের শেষভাগে হুল এবং মস্তকে একটি শোষক নল বা **দীর্ঘ প্রোবোসিস** (probosis) বিদ্যমান। এদের আয়ুষ্কাল গড়ে ৫০ দিন। বসন্ত ও শীতকালে এরা কঠিন পরিশ্রমে লিপ্ত থাকায় আয়ু কমে যায়। এইসময় এরা মাত্র ৬ সপ্তাহ বাঁচে।

আচরণ : কর্মী মৌমাছিদের শৈশব বলতে কিছু নেই কারণ এরা কলোনির জন্য সর্বদা নিবেদিত। শেষ বয়সে কর্মী মৌমাছি পানি পরিবহন করে ও অবসর যাপন করে। বাহ্যিক পরিবেশগত অবস্থার হঠাৎ পরিবর্তন ঘটলে কলোনির স্বার্থে বয়স নির্বিশেষে সবাই এক কাজ ছেড়ে অন্য কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অর্থাৎ কর্মী মৌমাছিদের মধ্যে **অ্যালট্রুইজম** সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। খাদ্য অন্বেষণকারী কর্মী মৌমাছি দু'ধরনের নৃত্য প্রদর্শন করে অন্যান্য মৌমাছিদের খাদের উৎস সম্পর্কে অবগত করে। এই দুই ধরনের নৃত্যকে (চক্রাকার নৃত্য ও ওয়াগল নৃত্য) **মৌমাছির ভাষা** (Bee language) বলে। বিজ্ঞানী **কার্ল ভন ফ্রিস** (Karl von Frisch) প্রথম মৌমাছির নৃত্যের গতি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এজন্য তিনি ১৯৭৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

কাজ : শ্রমিক মৌমাছি মৌচাকের যাবতীয় কাজ করে। যেমন : মৌচাক নির্মাণ, রানী ও পুরুষের সেবা, মধু ও মকরন্দ বা পুষ্পসুধা সংগ্রহ, মৌচাক পাহারা দেওয়া, চাক পরিষ্কার রাখা এবং সন্তান লালন-পালন করা।

৪। **শ্রমবণ্টন :** কলোনির বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন মৌমাছির সামাজিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন সদস্যের বিভিন্ন দায়িত্ব সংক্ষেপে দেওয়া হলো– **রানী :** চাকের সকল মৌমাছিকে নিয়ন্ত্রণ করা, সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া এবং ডিম দেওয়া। **পুরুষ :** রানীর সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া। **কর্মী :** কর্মীদের মধ্যে আবার বয়সভেদে শ্রমবণ্টন দেখা যায় এবং তারা হলো– আবর্জনা পরিষ্কারক (scavengers); চাক তৈরিকারক ও মেরামতকারক (mason); বাবুর্চি (cook); সেবিকা (nurse); সৈনিক (soldier); গুপ্তচর (scout); মধুকর (brewer); ডিম প্রদায়ী (laying workers) এবং বয়োবৃদ্ধ কর্মী (aged workers)।

৫। **খাদ্যের যোগান :** কলোনিতে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা সামাজিক প্রাণীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ আচরণ। বিশেষত কর্মী মৌমাছিরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে কলোনিতে খাদ্যের যোগান দেয়। এরা মৌচাকের নির্দিষ্ট কুঠুরিতে নিজেদের জন্য ও ভাবী বংশধরদের জন্য মধু ও পরাগরেণু সঞ্চয় করে থাকে।

৬। **বাৎসল্য আচরণ :** সামাজিক জীবনে বাৎসল্য আচরণ একটি অপরিহার্য দিক। রানী ডিম পাড়ার পর থেকে কর্মী মৌমাছিরা অপত্য লালনে তৎপর হয়ে ওঠে। তারা ডিম ও লার্ভার যত্ন নেয় এবং খাবার খাওয়ায়। ভাবী রানীর লার্ভাকে অধিক পরিমাণে রাজকীয় জেলি খাওয়ায় এবং কর্মী ও পুরুষ লার্ভাকে মধু ও মৌরুটি এবং স্বল্প পরিমাণে জেলি খাওয়ায়।

৭। **পারস্পরিক যোগাযোগ :** মৌমাছিরা স্বতন্ত্রভাবে নিজ স্বার্থে কোনো কাজ করে না। সুনির্দিষ্ট শ্রমবণ্টনের মাধ্যমে এরা সুশৃঙ্খলভাবে যার যার কাজ সমাধা করে। গন্ধবস্তু ছড়িয়ে এবং বিশেষ নৃত্যের মাধ্যমে এরা পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় ও যোগাযোগ সাধন করে থাকে। রানীর এক ধরনের গন্ধবস্তু মৌচাকে মৌমাছিদের আকৃষ্ট করে রাখে এবং অন্য এক ধরনের গন্ধবস্তু কর্মী মৌমাছিদের বন্ধ্যা অবস্থায় রাখতে সহায়তা করে। মৌমাছির নৃত্য দুই প্রকার, যথা–

ক. বৃত্তাকার বা চক্রাকার নৃত্য (Round dance) : এ ধরনের নৃত্য কতগুলো বৃত্তাকার গতিপথের সমাহার। খাদ্য উৎসের অবস্থান বাসার কাছাকাছি (৮০-১০০ মিটার এর মধ্যে) হলে মৌমাছিরা বৃত্তাকার নৃত্য পরিবেশন করে। এ নৃত্যের মাধ্যমে মৌচাকের অন্যান্য সদস্যদেরকে কোনো খাদ্যের উৎস সম্পর্কে অবহিত করে কিন্তু খাদ্যের উৎসের দিক সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা দেয় না। খাদ্য বা পুষ্পসুধা (nectar) মজুদের পরিমাণ বেশি হলে নৃত্যের ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধি পায়।

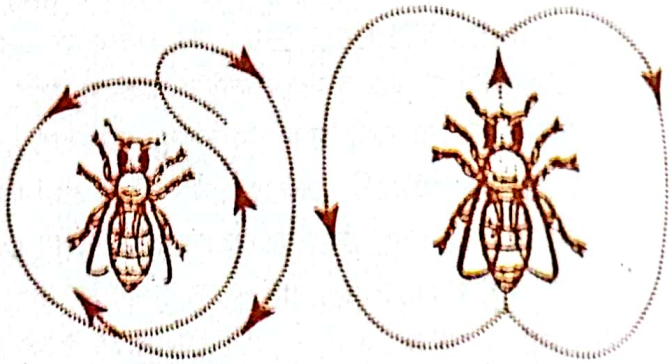

বৃত্তাকার নাচ ওয়াগল নাচ

চিত্র ১২.৩০ : মৌমাছির নৃত্য

খ. দোদুল্য বা ওয়াগল নৃত্য (Waggle dance) : এ ধরনের নৃত্যে এমন একটি গতিপথ সৃষ্টি হয় যা বাংলা ৪ (চার) অক্ষরের মতো দেখায়। খাদ্য উৎসের অবস্থান বাসা থেকে ১০০ মিটারের বাইরে হলে মৌমাছিরা দোদুল্য নৃত্য পরিবেশন করে। এ নৃত্যের মাধ্যমে একটি মৌমাছি মৌচাকের অন্যান্য সদস্যদেরকে দুই ধরনের তথ্য প্রকাশ করে থাকে, যথা- খাদ্য উৎসের অবস্থান মৌচাক হতে কত দূরে এবং কোন দিকে। খাদ্য উৎসের অবস্থান যত বেশি দূরে হয় নৃত্যের গতি বা ক্ষিপ্রতা তত কমে যায়। মৌমাছির নৃত্য বা উড্ডয়নের সময় ডানার দ্রুত সঞ্চালনে একটি নিম্নমাত্রার (২৫০-৩০০ হার্টজ) শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, যা দ্বারা মৌমাছিরা যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে।

৮। **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা :** রোগাক্রান্ত বা মৃত লার্ভা বা পিউপাকে চাকের বাইরে ফেলে দিয়ে মৌমাছিরা মৌচাককে পরিষ্কার রাখে ও সম্ভাব্য সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে।

৯। **প্রতিরক্ষা :** কর্মী মৌমাছিরা বিশেষ করে বয়স্করা চাক পাহারা দেয় এবং প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করে থাকে। কেউ চাকে হানা দিলে তাকে হুল ফুটিয়ে প্রতিহত করে থাকে।

১০। উত্তরাধিকার নির্বাচন : মৌচাকের সর্বসময় কর্মী যেহেতু রানী মৌমাছি, সেহেতু কোনো কারণে রানী মারা গেলে বা চাক ত্যাগ করলে কর্মী মৌমাছিরা রানীর নতুন উত্তরাধিকার নির্বাচনে সচেষ্ট হয়। এজন্য তারা ৩ দিন বয়সী এক বা একাধিক রানী কুঠুরির লার্ভা নির্বাচন করে তাকে বা তাদেরকে প্রয়োজনীয় রাজকীয় জেলি খাওয়ায়। এভাবে ১৬ দিনের মধ্যে কর্মী মৌমাছিরা নতুন রানীকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলে। কোনো চাকে একাধিক রানীর জন্ম হলে তাদের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং শক্তিশালী রানী অন্যদের হুল ফুটিয়ে মেরে ফেলে চাকের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে।

১১। ঝাঁক বাঁধা বা সোয়ার্মিং : মৌচাকে যেকোনো কারণে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এর চাপ কমাতে নতুন কলোনি সৃষ্টির জন্য রানী মৌমাছি কিছু পুরুষ ও কর্মী নিয়ে দিনের মধ্যভাগে উড়ে যায়। একে ঝাঁক বাঁধা বা সোয়ার্মিং (swarming) বলে। সোয়ার্মিংয়ের পর নতুন স্থানে চাক সৃষ্টি হয়। পুরাতন মৌচাকেও নতুন রানীর সৃষ্টি হয় এবং সেখানেও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চলতে থাকে।

মৌমাছি সামাজিক জীব। এরা মৌচাকে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। এদের অসামান্য পরিশ্রম করার ক্ষমতা, আত্মত্যাগ, সংহতি, সহনশীলতা উল্লেখযোগ্য। এরা শ্রমবণ্টনের মাধ্যমে আপন স্বার্থের কথা বিবেচনা না করে নিঃস্বার্থভাবে অন্যের মঙ্গলের জন্য আজীবন কাজ করে যায়। এদের সামাজিক জীবনযাত্রা এমনই চমকপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক যে, তাদের আচরণ ও কাজের বৈচিত্র্য, শৃঙ্খলাবোধ, সঞ্চয়ী বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি মানুষের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। এদের কাছ থেকে মানুষের অনেক কিছু শেখার আছে।

❑ **কাজ :** (i) অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মৌমাছির সামাজিক আচরণ অনেক উন্নত– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। (ii) মৌমাছিরা কীভাবে একে অন্যের উপকার করে তা বুঝিয়ে দাও। (iii) মৌমাছিদের ভাব বিনিময়ে নৃত্যের কৌশল ব্যাখ্যা কর। (iv) শিখন আচরণ কীভাবে সামাজিক আচরণকে প্রভাবিত করে? (v) মৌমাছি চরমভাবে অ্যালট্রুইস্টিক– বিশ্লেষণ কর। (vi) পারস্পরিক সহযোগিতা প্রাণিজগতের অনেক সদস্যে পরিলক্ষিত হয়– যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখ। (vii) মৌমাছি একত্রে বাস করে ঝাঁক বেঁধে সমাজবদ্ধ জীবের ন্যায় আচরণ করে– ব্যাখ্যা কর।

বয়সভেদে শ্রমিক মৌমাছির কাজের তালিকা–

বয়স (দিনে)	পালনীয় কর্তব্য
১-৩	কুঠুরি পরিষ্কার
৩-৬	বয়স্ক লার্ভার খাদ্য সরবরাহ
৬-১৫	তরুণ লার্ভার খাদ্য সরবরাহ
১০-২৩	চাক পরিষ্কার ও অন্যান্য গৃহকাজ
১০ ও তদূর্ধ্ব	চাক থেকে প্রথম উড্ডয়ন
১২-১৫	খাদ্য সংগ্রাহক মৌমাছি থেকে মকরন্দ বা পুষ্পসুধা গ্রহণ
১৬-১৮	মোম উৎপাদন ও মৌচাক নির্মাণে অংশগ্রহণ করা
২০ ও তদূর্ধ্ব	খাদ্য সংগ্রহ
২৪ ও তদূর্ধ্ব	পাহারার দায়িত্ব

রানী, পুরুষ ও কর্মী মৌমাছির মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য

তুলনীয় বৈশিষ্ট্য	রানী মৌমাছি	পুরুষ মৌমাছি	কর্মী মৌমাছি
১। আকার	আকারে বড়।	আকারে কিছুটা ছোট। তবে কর্মী মৌমাছির চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড়।	আকারে ছোট অর্থাৎ কলোনির ক্ষুদ্রতম সদস্য।
২। প্রজনন	প্রজননে সক্ষম।	প্রজননে সক্ষম।	প্রজননে অক্ষম।
৩। মৌচাকের কাজ	মৌচাকের কোনো কাজেই অংশ নেয় না।	অংশ নেয় না।	অংশ নেয়।
৪। খাদ্য সংগ্রহ	খাদ্য সংগ্রহে অক্ষম।	খাদ্য সংগ্রহে অক্ষম।	খাদ্য সংগ্রহে সক্ষম।
৫। মধু ও পরাগ সংগ্রহ	মধু ও পরাগ সংগ্রহে অংশ নেয় না।	অংশ নেয় না।	অংশ নেয়।
৬। ফেরোমন	নিঃসৃত করে।	নিঃসৃত করে না।	নিঃসৃত করে না।
৭। আয়ুষ্কাল	প্রায় ২-৩ বছর।	প্রায় ৫০-৬০ দিন।	প্রায় ৫০ দিন।